অবিস্মরণীয় চীন

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ •
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪

প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক : সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রিণ্টার : শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

চিরস্মরণীয় দিন

ছাব্বিশে জুলাই উনিশ শ' তিপ্পান্ন। দিনটি আমার জীবনে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেননা ওই দিনটিতে চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের সঙ্গে আমার কথা বলবার সৌভাগ্য হয়। জানি, আমার ব্যক্তিগত কোন কীর্তির জন্য ও সৌভাগ্য আমার হয়নি। ঘটনাচক্রে সারা ভারত শান্তি সংসদ প্রেরিত প্রতিনিধিদলের নায়কত্ব করবার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হয় বলেই, আমি ওই সৌভাগ্যের অধিকারী হই। আমাকে এবং ডেলিগেশন কমিটির আর চারজন সদস্যকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছিল, আসলে সে সম্মান কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়নি—দেওয়া হয়েছে ভারতবর্ষকে, দেওয়া হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিকে, দেওয়া হয়েছে ভারতবর্ষের শান্তি আন্দোলনকে। আমরা নেহাতই উপলক্ষ। তবুও গৌরব অনুভব করি।

কেন তা করি? অতবড় একটা জাতির পঞ্চাশ কোটি নর-নারীকে যিনি দীর্ঘকালব্যাপী অত্যাচার থেকে, উপদ্রব থেকে, লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিলেন, সম-অধিকার দিলেন, মানুষের পূর্ণ মর্যাদা দিলেন, বুভুক্ষা দূর করলেন, সর্বহারাদের পায়ের তলা থেকে যে-মাটি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই মাটির ওপর আবার তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তাঁকে চোখে দেখা, তাঁর সঙ্গে কথা বলা সৌভাগ্য নয়?

মাও সে-তুঙ আর তাঁর সহকর্মীরা জাপানী-সাম্রাজ্যবাদীদেরকে চীন থেকে তাড়িয়েছেন, কুয়োমিনটাঙের প্রতিক্রিয়াশীল দলের অনাচার থেকে দেশকে রক্ষা করেছেন চিয়াং কাইশেককে বহিষ্কৃত করে। যে শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি আর তাঁর সহকর্মীরা তা করতে পেরেছিলেন, সে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি। সে পার্টিরও নায়ক তিনিই, উপনায়করা তাঁরই অনুরাগী সহকর্মীরা। কিন্তু ক্ষমতা আয়ত্তে পেয়ে তিনি পার্টি-শাসন প্রতিষ্ঠিত করলেন না, সমগ্র জাতিকে দিলেন আত্ম-শাসনের অধিকার; রাষ্ট্রকে হতে দিলেন লোকায়ত প্রজাতন্ত্র; গবর্নমেণ্টকে করলেন জাতীয় গবর্নমেণ্ট। তাঁর পার্টিকে বোঝালেন—'সকল ফুল দলে দলে ফুটে উঠুক, তবেই না বাগান রচনা সার্থক হবে।' তাঁর পার্টিকে বল্লেন—'প্রাণপণে জন-সেবা কর। মানুষকে ফুলের মতো ফুটে ওঠবার ব্যবস্থা করে দাও। শক্তির দম্ভ নিয়ে জোর করে তাকে ফোটাতে চেয়ো না। বিশ্বাস রাখ জমি ঠিক মতো পাট হলে, তাতে ঠিক মতো সার পড়লে, উপযুক্ত আবহাওয়ার সঞ্চার হলে, মানুষ পূর্ণ বিকশিত হবে।' ক'জনা নেতা সংগ্রামে জয়লাভ করবার পরই এমন করে তাঁর সহযোদ্ধাদের বলেছেন, যুদ্ধে জয়ী হয়ে যে ফল অর্জন করেছ লোভে পড়ে তা আত্মসাৎ না করে সবাইকে ভোগ করতে দাও এবং নিজেদের লোভ সংযত রেখে জন-সেবায় আত্ম-নিয়োগ কর? মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আর কাউকে হালে এমন কথা বলতে শুনিনি। মহাত্মা অদ্বিতীয় জন-নায়ক হয়েও সংগ্রাম-অন্তে একান্তই একক হয়ে পড়েছিলেন তাঁর আদর্শ নিয়ে, আর চেয়ারম্যান মাও কমিউনিস্ট পার্টির শুভবুদ্ধিজাত সহযোগিতার ফলে পার্টি-নায়ক থেকে পঞ্চাশকোটি চীন-নরনারীর চিত্তের নায়ক হয়ে রয়েছেন। আজকার কৃষক, আজকার শ্রমিক, আজকার লেখক, আজকার গায়ক, আজকার

অভিনেতা, আজকার অভিনেত্রী, আজকার চিত্রী, আজকার ডাক্তার, আজকার রুগী এবং বিশেষ করে আজকার ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের আনন্দময় জীবনের ইতিহাস শোনাতে শোনাতে বারবার শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতাভরা চোখ দিয়ে মাও সে-তুঙের ছবির দিকে চেয়ে দেখে—সে ছবি যেমন থাকে কৃষকের কুটীরে, তেমন থাকে ফ্যাক্টরিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মিউজিয়ামে, হাসপাতালে, স্যানাটোরিয়ামে, সঙ্গীত-কনজারভেটরিতে, হোটেলে, রেলওয়ে স্টেশনে, যেখানেই দশজন লোক জড়ো হবে সেইখানেই। সেই দৃঢ়-প্রত্যয় প্রকাশক হাসিমাখা মুখখানি যে সমগ্র চীন-অধিবাসীর ধ্যানের বিষয় তারই প্রতীক হয়ে রয়েছে যেন সর্বত্র ওই চিত্র।

অথচ চেয়ারম্যান মাও কি মহাবিপ্লবই না এনেছেন আজকার চীনে। চীনের অতীত রাজনীতি, অতীত অর্থনীতি, অতীত শিক্ষা-নীতি, অতীত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, সবই আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কঠোর আঘাতের ক্ষত কোথাও নেই। সর্বদলের স্বীকৃত পরিকল্পনা অনুসারে জাতিকে ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াসে কোন বিরোধিতার সম্ভাবনা নেই—রেভোলিউশনারি পেজাণ্ট পার্টি, রেভোলিউশনারি কুয়োমিনটাং পার্টি, পেতি-বুর্জোয়া, ন্যাশনালিস্ট ক্যাপিটালিস্ট, সকলেই কমিউনিস্টদের মতোই, জাতীয় ট্রেড-ইউনিয়নের মতোই, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পাঁচ বছরের আগেই পূর্ণ করবার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছেন। সংগ্রাম-বিজয়ী চেয়ারম্যান মাও ক্ষমতা আয়ত্তে পেয়ে যদি পার্টি-শাসন প্রতিষ্ঠা করতেন, তাহলে এই ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মহাপ্রয়াস সম্ভবপর হত না। চেয়ারম্যান মাও তাঁর সহকর্মীদের আর একটি কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেন। তা হচ্ছে পুরাতনকে ধ্বংস করতে চেয়ো না, তাকে নব রূপ দিয়ে সঞ্জীবিত কর। তাঁর সহকর্মীরা তাই যা করছেন,

তার পরিচয় আজকার চীনের সর্বত্র পাওয়া যায়—যেমন ভূমি-সংস্কারজাত প্রচুর উদ্বৃত্ত ফসলে, তেমন চুয়াম্ন বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত আজকার পেইটা, অর্থাৎ পিকিং ইউনিভার্সিটিতে, তেমন মি ল্যান-ফ্যাঙ পরিচালিত পিকিং অপেরায়, তেমনই সকল মিউজিয়ামে, অতীতের সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের প্রাসাদে। সমগ্র জাতিকে নব জীবনের দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ করে যিনি জাতিকে নিত্যই এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিচ্ছেন, তিনি নর-দেবতা রূপে বন্দনা পাবেন না কেন ?

যেদিন প্রথম পোলিটিক্যাল কন্‌সাল্‌টেটিভ কমিটি, অর্থাৎ, সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তার পরের দিনেই, দোসরা অক্টোবরেই, সারা চীন শান্তি কমিটি (অল চায়না পীস কমিটি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পোলিটিক্যাল কন্‌সাল্‌টেটিভ কমিটিতে যেমন কৃষকের, শ্রমিকের, লেখকের, শিল্পীর, এঞ্জিনিয়ারের, ডাক্তারের, শিক্ষকের, অধ্যাপকের স্থান রয়েছে ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে, তেমনই রয়েছে শান্তি কমিটিতে। আর এই শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন স্বনামখ্যাত, চীনের সর্বজন-সম্মানিত, কবি-নাট্যকার-প্রবন্ধকার সহকারী প্রধানমন্ত্রী প্রবীণ এবং প্রাজ্ঞ কুয়ো-মো-জো। কেবল চাঁদা দিয়েই চায়না পীস্ কমিটির সদস্য হওয়া যায় না ; প্রতিনিধিত্বের পরোয়ানা চাই। গবর্নমেণ্ট গঠন করবার সঙ্গে সঙ্গেই যে দেশনায়ক শান্তি কমিটি স্থাপন অত্যাবশ্যকীয় মনে করেন, তাঁর চিন্তাধারা কোন্ খাত বয়ে চলেছে, তা অনুমান করা শক্ত নয়। সংগঠন ও শান্তি ছাড়া মানুষ যে তার মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠার এবং বিকাশের সুযোগ পাবে না. যে মানব-নায়ক তাই বুঝে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের সকল অন্তরায় দূর করে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে চান, কোন্ মানুষ তাঁকে বন্দনা জানাবে না ?

চীন পরিভ্রমণকালে সব চেয়ে আগে যা মনে হয় তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র জাতিটিই হচ্ছে শিল্পী। ক্যান্টন থেকে পিকিং যাবার

পথে তিনদিন ট্রেনে বসে ওই সত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ক্ষেত-খামার বাড়ি-ঘর সবই পারিপার্শ্বিক পাহাড়-হ্রদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচিত। সবুজ ক্ষেত শেষ হয়েছে হ্রদের ফিকে নীল জলে; তারই পরপারে ঘন-নীল পাহাড়, তারও উর্ধ্বে আকাশের নীলিমায় ভেসে বেড়ায় শুভ্র মেঘমালা, মাঝে মাঝে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিচিত্র বর্ণের প্যাগোডা, নীল-বনানীর পাশে শ্বেতবর্ণের কৃষক-কুটীর, লাল টালিতে ছাওয়া ছাদ। কোন পরিকল্পনা করে এই বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটানো হয়নি, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে এই বর্ণ-সমন্বয়ে। বিস্ময়ভরা চোখ দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছি ধানের গমের ভুট্টার সিমের পরিপাটি ক্ষেতগুলির দিকে—অযত্নের, অবহেলার, ঔদাসীন্যের কোন লক্ষণ দেখতে পাইনি। ক্ষেতগুলিও যেন শিল্পীর রচনা। অন্য এক অঞ্চলে কিছুদিন পরে চারদিন ট্রেনে কাটিয়েছিলাম। সে অঞ্চলেও অনুরূপ চিত্র, কেবল কোথাও কোথাও পাহাড়ের পরিবর্তে দেখেছি মিল-ফ্যাক্টরি, আর শাদা মেঘকে ধূসর করে দিচ্ছে চিমনির ধোঁয়া। পিকিং শহরটা দু'দিন ঘুরতেই নিঃসংশয়ে বোঝা গেল সুদূর অতীতে যে শিল্প-প্রেরণা চীনকে মানব-সভ্যতার অন্যতম স্রষ্টা করেছিল, সেই শিল্প-প্রেরণায় চীন আজও অনুপ্রাণিত আছে বলেই সৃষ্টির কাজকে সে অত সহজভাবে, স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে। পিকিংয়ের শান্তি-হোটেলে বিখ্যাত পণ্ডিত, চীন-ভারত মৈত্রী সংস্থার সহ-সভাপতি 'চায়না রিকন্স্ট্রাক্টস' কাগজের সম্পাদকীয় বোর্ডের সহ-সভাপতি, ঐতিহাসিক ডক্টর চেন হেন-সেঙের সঙ্গে আলাপ করতে করতে যখন বল্লাম যে, পথে আসতে আসতেই আমি আবিষ্কার করেছি সমগ্র চীন জাতিই হচ্ছে শিল্পীর জাতি, তখন তিনি হেসে বল্লেন—"আপনি নাট্যকার, তাই চীনের প্রথম পরিচয় ওই ভাবেই

আপনার কাছে প্রকাশ পেয়েছে। শিল্প সৃষ্টি বহু সাধনা-সাপেক্ষ।” হঠাৎ উঠে ঘরের দেয়ালে টাঙানো একখানা ছবি দেখিয়ে বল্লেন, “এ ছবিখানি কিন্তু আপনি দেখবেন না। ছবি দেখতে ইচ্ছে হলে ওই ছবিখানির দিকে চেয়ে দেখবেন।” অপর দেয়ালে টাঙানো ছবিখানির কাছে গিয়ে বল্লেন—“সত্যিই সুন্দর ছবি। না?” জবাবে আমি বল্লাম—“ডক্টর আপনি যেমন সপ্রশংস দৃষ্টিতে আপনার বহুবার-দেখা ওই ছবিখানি দেখছেন, তাতেই প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে আমার আবিষ্কার সম্পূর্ণ সত্য, সমগ্র চীন জাতিই হচ্ছে শিল্পীর জাতি।” তিনি পুনরায় আসন গ্রহণ করতে করতে বল্লেন—“হ্যাঁ, কথাটা আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। আমরা সকল রকম ডিক্রী বর্জন করেছি। চীনে এখন আর পি-এইচ-ডি নেই, এম-এ নেই, বি-এ নেই; একমাত্র পরিচয় হচ্ছে ওয়ার্কার।” প্রাণখোলা প্রসন্ন হাসি। বোঝা ফেলে দিতে পেরে যেন তিনি বেঁচেছেন। প্রগাঢ় পণ্ডিত, কিন্তু পাণ্ডিত্যের এতটুকুও অভিমান নেই। আবার ছবির কথা উঠতেই তিনি যামিনীদার কথা জানতে চাইলেন। আমি বল্লাম আমি যামিনীদার দাদা; জীবনের অনেক সুখ-দুঃখ একসঙ্গে ভাগ করে ভোগ করেছি। তিনি বল্লেন—“আহা! সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন?” আমি বল্লাম—“জানেন না তো কী কুনো লোক তিনি।” “জানি। কলকাতায় আলাপ করতে গিয়েছিলাম। আমাদের খুব ইচ্ছে তিনি একবার চীনে আসুন।” অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি বল্লেন। সঙ্গে সঙ্গেই অনুরোধ করলেন—“আবার যখন আসবেন, সঙ্গে নিয়ে আসবেন।”

আমি বল্লাম—“আবার আসবার সুযোগ কি হবে।”

“কেন হবে না?” জানতে চাইলেন তিনি। জবাব না দিয়ে মাথার পাকাচুল দেখিয়ে দিলাম।

“কত বয়েস হলো?”

"বাষট্টি।'

"আমাদের কবি-নাট্যকার কুয়ো মো-জো আপনার চেয়েও বয়স্ক; আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা মি ল্যান-ফ্যাঙ প্রায় আপনারই বয়েস পেয়েছেন; যে ছবিখানির প্রশংসা করছিলাম তা যিনি এঁকেছেন, তাঁর বয়েস নব্বই বছর। এখনো তিনি ছবি আঁকছেন।"

"চেয়ারম্যান?"

"তিনি তো পঞ্চাশ পেরুবার আগে কিশোর ছিলেন, যৌবন পেলেন দেশের মুক্তি এনে।" হাল্কা-রস দিয়ে কথাগুলো বল্লেন, কিন্তু মুখ তাঁর গরবে প্রোজ্জ্বল।

আমি বল্লাম—"আমার দ্বিতীয় আবিষ্কারের কথা শুনবেন?"

"বলুন।" অনুমতি দিলেন তিনি।

"চেয়ারম্যান কবি; কবি বলেই দার্শনিক; দার্শনিক বলেই জাতির জীবন-দর্শনে তিনি ভুল করেন নি এবং কাব্য-প্রণোদিত দার্শনিক বলেই তাঁর দর্শন জীবনরাগরঞ্জিত মনের দর্শন। তাই তিনি স্রষ্টা, শিল্পীর সৃষ্টির মতো তাঁর সৃষ্টি, তিনি বর্তমান প্রাচ্যের সর্বোত্তম শিল্পী।"

"পড়েছেন তাঁর লেখা?"

"না। বক্তৃতা কিছু কিছু পড়েছি। আপনাদের মুখে শুনে মেনে নিয়েছি প্রয়াসের পরিচয় পেয়ে।"

"মানুষটিকে আগে দেখুন, তাঁর নিজের মুখের কথা আগে শুনুন।"

"সে সৌভাগ্য কি হবে?"

"নিশ্চয় হবে। আপনারা চীনের আমন্ত্রিত অতিথি।"

সেদিনও জানিনি কবে দেখা হবে, কেমন করে দেখা হবে। শুধু জানতাম ছাব্বিশে জুলাই তারিখে পীস্-হলে আমাদের আসর বসবে আর সেই আসরে উপস্থিত থাকবেন চীন গবর্নমেণ্টের বিশিষ্ট কর্মীরা, পিকিংয়ের বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা, শিল্পীরা, গায়ক-গায়িকারা,

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। আসর ভাঙবার পর প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীন গবর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে এবং পিপ্‌ল্‌স রিপাবলিকের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলকে স্টেট-ব্যাঙ্কোয়েট দিয়ে সম্মানিত করবেন। তাই আমাদের আগে থেকেই জানানো হয়েছিল যে ওই রাতের প্রোগ্রাম যাতে দুই ঘণ্টায় শেষ হয়, তার ব্যবস্থা যেন আমরা করি। দেবব্রত বিশ্বাসের ওপর দৈনিক প্রোগ্রাম রচনার ভার দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

ছাব্বিশে জুলাই সকাল-বেলায় ভারতীয় দূতাবাসের একজন বিশিষ্ট কর্মী আমার ঘরে এসে আমাকে বল্লেন তিনি বোম্বাই প্রদেশের কয়েকজন নারী ও পুরুষ প্রতিনিধিকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা যে প্রতিনিধিদলের নেতাও তাঁর অতিথি হয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। তিনি নিছক ভারতীয় খানা তৈরি করে খাওয়াবেন। আমাদের আপ্যায়ন-কর্তাদের অনুমতি নিয়ে আমি সম্মতি দিলাম—অনেক দিন পরে ডাল আর ঝাল-দেওয়া তরকারী পাওয়া যাবে।

সেই ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় বসে গল্প-গুজব করছি এমন সময় ভারতীয় দূতাবাসের আর একটি ভদ্রলোক আমাকে নিরালায় নিয়ে গিয়ে জানালেন যে বেলা পাঁচটায় চেয়ারম্যান মাও ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতাকে স্বাগত জানাবেন।

"সে কি!" তাঁর মুখ থেকে খবরটা প্রথম শুনলাম বলেই আমার বিস্ময়।

"ফরেন অফিস থেকে একটু আগে হিজ-এক্‌সেলেন্সিকে এই খবর দেওয়া হয়েছে। তিনি জানতেন আপনি এখানে আসবেন। তাই আপনাকে খবরটা দিতে আমাকে পাঠালেন।"

"আমাদের হোস্টরা তো এ-সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলেন নি।"

"হয়ত আপনি যখন হোটেলে ফিরে যাবেন তখন বলবেন।"

"তাই হবে বা।" আমি সংশয় রেখেই বল্লাম।

"পাঁচটার সময় দূতাবাসের গাড়ি যাবে আপনার হোটেলে। আপনি দূতাবাসে যাবেন। রাষ্ট্রদূত আপনাকে চেয়ারম্যানের কাছে নিয়ে যাবেন।"

আমার সংশয় বেড়ে গেল। এলাম অল চায়না পীস্ কমিটির আমন্ত্রণ পেয়ে। আর চীন রিপাব্লিকের চেয়ারম্যানের কাছে তাঁরা নিয়ে যাবেন না, নিয়ে যাবেন আমাদেরই ঘরের লোক, আমাদের রাষ্ট্রদূত। বার্তাবহ ভদ্রলোকটিকে বল্লাম, হোটেলে ফিরে গিয়ে আমাদের হোস্টদের (আপ্যায়ন-কর্তাদের) যে প্রতিনিধি সর্বসময়ে আমাদের সঙ্গে থাকেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি হিজ একসেলেন্সির সঙ্গে ফোনে কথা কইব।

হোটেলে ফিরে আমি আমাদের হোস্টদের প্রতিনিধিকে সবকথা বল্লাম। তিনি কিছুই জানেন না। আমি মুস্কিলে পড়লাম। ফরেন অফিস থেকে যদি সাক্ষাৎকার স্থির হয়েই থাকে আমি না গিয়ে পারি না, আবার হোস্টদের অজানায় তাঁদের আমন্ত্রিত ডেলিগেশনের নেতা কেমন করেই বা তাঁদের চেয়ারম্যানের সামনে উপস্থিত হতে পারে? কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় রাষ্ট্রদূতকে ফোন করলাম। তাঁর জবাব শুনে কূল পেলাম। তিনি বল্লেন আগেকার ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে। চেয়ারম্যান প্রতিনিধিনেতা, কবি ভাল্লাথল আর প্রতিনিধি কমিটিকে রিসিভ করবেন, সুতরাং তিনি আর আমার জন্য গাড়ি পাঠাবেন না, আমাদের হোস্টদের ব্যবস্থা মতোই কাজ হবে। তাঁর সঙ্গে হয়ত চেয়ারম্যানের ওখানেই আমার দেখা হবে।

চেয়ারম্যান কোথায় থাকেন জানি না। কিন্তু তা নিয়ে দুর্ভাবনার কারণ নেই। কেননা হোস্টরা যথাসময়ে যথাস্থানে আমাদের নিয়ে

যাবেন। ডেলিগেটদের খবরটা জানালাম যে ছয়টার সময় চেয়ারম্যান মাও নেতাকে, মহাকবি ভাল্লাথলকে, কমিটির সদস্য হীরাবাঈ বরদাকরকে, বিলায়েত হুসেন খাঁকে আর কমিটির সম্পাদক কলিমুল্লা খাঁকে স্বাগত জানাবেন।

যথাসময়ে খবর এলো গাড়ি প্রস্তুত। গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। লীডারের আর মহাকবি ভাল্লাথলের জন্য সর্বত্রই স্বতন্ত্র দু'খানা গাড়ি থাকত, পিকিংয়ে কমিটির সদস্যদের জন্যও স্বতন্ত্র একখানা গাড়ি থাকত, প্রতিনিধিদলের সদস্যদের এবং আটদশজন দোভাষীর জন্য দু'খানা বাস থাকত। সকলেই নিজ-নিজ গাড়িতে উঠে বসলাম। কোথায় যাবেন চেয়ারম্যান যাঁদেরকে দেখা দেবেন, কোথায় যাবেন প্রতিনিধি-দলের সদস্যরা জানিনা। পাইলট গাড়ি অনুসরণ করে চলেছে আমাদের গাড়ির বহর পিকিংয়ের জানা-অজানা পথ বয়ে। প্রকাণ্ড একটা ফটকের ভেতর গাড়ি ঢুকল। ফুল-ফলের গাছ আর উইলোর সারির ভিতর দিয়ে রাস্তা। গাড়ি থামতেই পাইলট গাড়ি থেকে পীস্-কমিটির সংযোগরক্ষাকারী অফিসার মিঃ উ এসে আমাকে নামতে বল্লেন এবং জানালেন এইখানেই চেয়ারম্যান মাও আমাদের দেখা দেবেন, এইখানেই হবে আমাদের অভিনয় আর এইখানেই হবে স্টেট-ব্যাঙ্কোয়েট। যেখানেই আমাদের অভিনয় হত সেইখানেই প্রতিনিধি-নেতার জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘর থাকত। এখানকারও সেই ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল এবং কথা-প্রসঙ্গে জানলাম এই বাড়িটির নাম হুহাই জন তেঙ হল, সাধারণত বলা হয় পীস্ হল। বড় বড় মিটিং এইখানেই হয়। হলটি দেখাবার জন্য আমাকে প্রথমত মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হল। প্রকাণ্ড মঞ্চ, প্রচুর আলোর ব্যবস্থা আছে, প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগৃহ, বসবার আসনের সামনে হাই-ডেস্ক। ঘরটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। কাউন্সিল মিটিং এইখানেই হয়। ভালো করে দেখবার সময় হল না, কেননা

সাক্ষাৎকারের সময় আসন্ন। আমাদের পাঁচজনকে নিয়ে যাওয়া হল অভ্যর্থনা হলে। আমাদের সঙ্গে অতিরিক্ত একজন প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি হচ্ছেন মহাকবির পুত্র বালকৃষ্ণ। তিনি তাঁর পিতার দোভাষী। মহাকবি মালায়লম আর সংস্কৃত ছাড়া আর কোন ভাষা জানেন না।

অভ্যর্থনা হলে ঢুকে দেখি আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রীরাঘবন এবং মিসেস রাঘবন এসে পৌঁচেছেন। আরো কয়েকজন সেখানে ছিলেন। বসে বসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলছি। সামনেই বড় বড় খোলা জানালা। হঠাৎ সেই জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম মাও সে-তুঙ এগিয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। গায়ে সেই গলাবন্ধ কোট। যেতে যেতে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন। আগে-পিছে এইড-ডি ক্যাম্প নেই, মিলিটারি য়্যাটাশি নেই, একেবারে একক। পর পর তিন-চারটি জানলা অতিক্রম করে তিনি এগিয়ে চল্লেন। আমার দৃষ্টিও তাঁকে অনুসরণ করে জানলা থেকে জানলা অতিক্রম করে চল্ল। অবশেষে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কতটুকু সময়ের ঘটনা। কিন্তু মনে হলো কতক্ষণ ধরে যেন দেখলাম। একটু পরেই খবর পেলাম আমাদের তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রদূত আমাদের ভার নিলেন। তাঁর পেছনে পেছনে সারি বেঁধে আমরা কয়েকজন অগ্রসর হলাম।

প্রকাণ্ড সুসজ্জিত ঘরের ঠিক মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, যেন একসঙ্গে শক্তির ও প্রীতির প্রতীক। পাশে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই—নিবিড় কৃষ্ণ যুগল-ভ্রূ, প্রদীপ্ত দৃষ্টি, দৃঢ়প্রত্যয়পূর্ণ মুখ-ভাব। মিঃ রাঘবন একে একে আমাদের পরিচয় দিতে লাগলেন, উভয়েই প্রত্যেকের সঙ্গে কর-মর্দন করলেন, সন্তোষ জানালেন। তারপর চেয়ারম্যান মাও আমাদেরকে আসন গ্রহণ করতে বল্লেন। আমরা

আসন গ্রহণ করার পর তিনি আমাদের কুশল প্রশ্ন করলেন—"দূর দেশে এসে সকলের স্বাস্থ্য ভালো আছে তো ?"

আমি বল্লাম—"দেহে-মনে আমরা সবাই বেশ সুস্থ আছি।"

—"খাওয়া-দাওয়ার কিছু কষ্ট নিশ্চিতই হচ্ছে ?"

—"কিছুমাত্র নয়।"

—"চীনে-খাবারে রুচি হচ্ছে ?" স-কৌতুক প্রশ্ন।

—"আমরা চীনে খাবারও খাচ্ছি আরার ভারতীয় খাবারও পাচ্ছি।"

—"কী করে ?" কৌতূহলে তাঁর চোখ দুটি বড় হয়ে উঠল।

—"যে ছেলে-মেয়েরা আমাদের সেবার ভার নিয়েছে, ভাষা তর্জমার দায়িত্ব নিয়েছে, আশ্চর্য উপাদান দিয়ে তারা গঠিত হয়েছে। যেমন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, তেমন জন-সেবার আগ্রহ, তেমনই বিস্ময়কর নিয়মানুবর্তিতা। কার কি খেতে অসুবিধে হচ্ছে, কেন তা হচ্ছে, তাই জেনে নিয়ে আমাদের মেয়েদের সঙ্গে খাদ্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে হোটেলের সূপকারদেরকে দিয়ে ভারতীয় খাদ্য তৈরি করিয়ে আমাদের খাওয়াচ্ছে। নতুন চীনের এই নবীন-নবীনারা অনুপম সৃষ্টি।" মুখ তাঁর আরো প্রসন্ন হয়ে উঠল।

একটুকাল চুপ করে থেকে তিনি বল্লেন—"কিন্তু তাই বলে ভাববেন না চীনের সব লোকই ভালো লোক।" কি বলবেন অনুমান করতে পারলাম না। বুঝতে পেরেই তিনি বল্লেন—"চিয়াং কাইশেক চীনেরই ছেলে তাও ভুলবেন না।" কণ্ঠে বিদ্রূপ নেই, ব্যথা আছে। লোকটি জাতির মানুষের কত অনিষ্ট করেছে এবং এখনো কত অনিষ্ট করবার ফিকিরে আছে সেই চিন্তাই যেন ক্ষণকাল তাঁকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে রাখল। কিন্তু তখুনি সে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বল্লেন—

"দেখুন ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব খৃষ্ট জন্মেরও হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। আপনারা তো জানেনই সেই সুদূর অতীতেও আমাদের দুই জাতিতে কেবল সংস্কৃতিরই বিনিময় হত না, পণ্যেরও বিনিময় হত। বিদেশীদের সঙ্গে মৈত্রীর কথায় ভারতবর্ষের সবার আগে চীনকেই মনে পড়ত, চীনেরও মনে পড়ত ভারতবর্ষকে। পাশাপাশি দেশ, সুদীর্ঘ সাধারণ সীমান্ত; শক্তি ভারতবর্ষেরও ছিল, শক্তি চীনেরও অনায়ত্ত ছিল না। কিন্তু ইতিহাসে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ নেই যাতে ভারতবর্ষের চীনকে আক্রমণ করার কি চীনের ভারতবর্ষকে আক্রমণ করার প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়।" কথাগুলো এমন ধীরে ধীরে এমন স্বপ্ন-বিভোর স্বরে বল্লেন যে চীন-ভারত মৈত্রীর গোটা ঐতিহাসিক চিত্র মনের পটে ফুটে উঠল।

তিনি বলে চল্লেন—"হাজার হাজার বছরের মৈত্রী বন্ধন ছিঁড়ে গেল পরবশতার দিনে। ভারতবর্ষও পরবশ হলো, চীনের বুকেও নানা জাতির লোকরা এসে চেপে বসল। দু' দেশেরই সংস্কৃতির মূলে পড়ল প্রচণ্ড আঘাত। বিদেশীদের অপপ্রচারের ফলে দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব-বন্ধন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তারা আপনাদেরকে আমাদের সম্বন্ধে আর আমাদেরকে আপনাদের সম্বন্ধে কতই না ভুল বোঝালে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যেন মনে মনে ভুলের পরিমাপ করে নিলেন। তারপরই আবার শুরু করলেন—"আজ দুর্যোগ কেটে গেছে। আজ আপনারাও স্বাধীন হয়ে আত্ম-সংস্কৃতির সন্ধান করছেন, আমরাও লিবারেশনের পর থেকে সারা মন দিয়ে তাই করছি। আমাদের আমন্ত্রণ আর আপনাদের তাতে সাড়া দিয়ে ছুটে আসা থেকে এই-ই প্রমাণিত হয় যে, আমরা পরস্পরের মৈত্রী, পরস্পরের সংস্কৃতির বিনিময় কাম্য মনে করি। পৃথিবীর সকল মানুষের মৈত্রী আমরা চাই, সকলের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। আমরা-আপনারা তা

চাই, কিন্তু সকলে তা চায় না। আমাদের বন্ধুত্ব তাদের চাওয়া না-চাওয়ার ওপর নির্ভর করে না।"

আবার একটুকাল চুপ করে রইলেন। পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন—"আমাদের সবই আছে। লোকবল আছে, প্রকৃতির দেওয়া প্রচুর সম্পদ আছে, মূল্যবান ঐতিহ্য আছে—নেই শুধু বর্তমান কালোপযোগী কলকারখানা। এই কলকারখানা গড়ে তোলবার আয়োজন আপনারাও করছেন, আমরাও করছি। আমরা যদি এ-বিষয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হতে পারি, তাহলে আমাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে বিদেশীরা আমাদেরকে বিব্রত করতে পারবে না। আপনারা ত্রিশ-কোটি আর আমরা পঞ্চাশকোটি, এই আশিকোটি লোক যদি মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার রোধ করার জন্য পাশাপাশি দাঁড়াতে পারি, তাহলে অন্তত এশিয়ার মানুষ নিরপদ্রুত থাকতে পারে, হয়ত পৃথিবীর সকল মানুষেরও তাতে মঙ্গল হয়।" আবার তিনি চুপ করলেন, মন হয়ত তাঁর চলে গেছে অনাগত দিনের দিকে।

সেই মনকে ফিরিয়ে এনেই যেন বল্লেন—"ভারতবর্ষ থেকে আপনারাও এলেন শান্তির বাণী নিয়ে, আর কোরিয়া-যুদ্ধেরও বিরতি ঘোষিত হল। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে আগামীকাল সকালেই যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।" এই শুভ-সংবাদ আমাদের তো অজানা ছিলই, সেই ঘরে উপস্থিত ব্যক্তিরা ছাড়া পিকিংয়ের আর কোন লোকই হয়ত তা জানতেন না।

আমাদের রাষ্ট্রদূত চৌ এন-লাইয়ের উল্লেখ করে বল্লেন—"হিজ একসেলেন্সির প্রয়াসেই এ সম্ভবপর হলো।" তাঁরা দৃষ্টি বিনিময় করলেন, কিন্তু কেউ কিছু বল্লেন না।

আমি বল্লাম—"ইওর একসেলেন্সি, আজিকার এই মুহূর্তটি আমাদের জীবনের পরম মুহূর্ত। আমরা একই সময়ে আপনার দর্শন

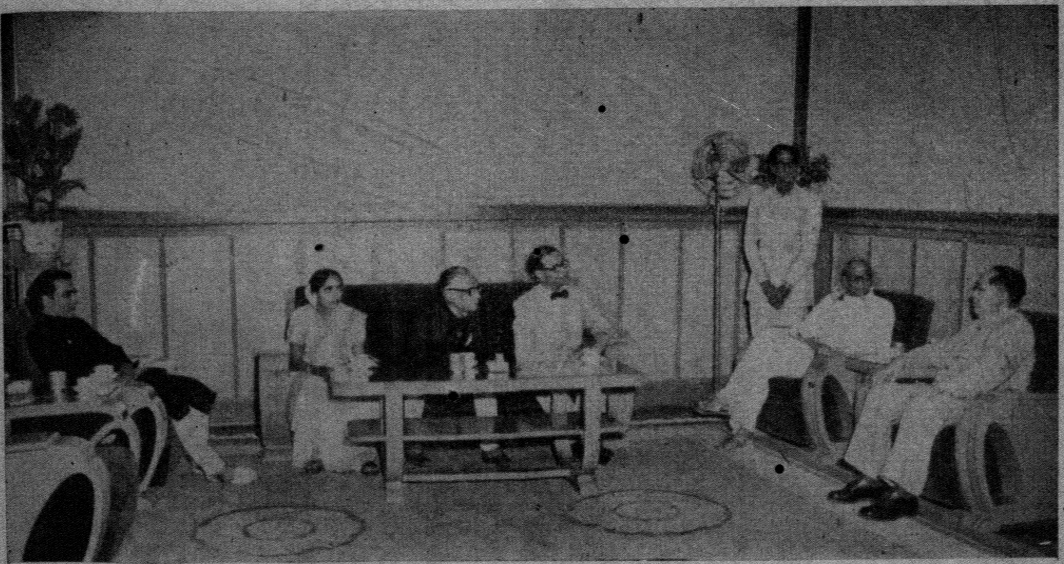
পেলাম এবং আপনার মুখ থেকেই কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতির সংবাদও শুনলাম।"

চেয়ারম্যান মাও শুধু হাসলেন, কোন কথা বল্লেন না। আমাদের সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে গেল। সকলেই উঠে দাঁড়ালাম এবং বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার লাঠিখানা অন্যত্র রেখে এসেছিলাম। তাই নিয়ে ফিরে আসবার সময় প্রেক্ষাগৃহে প্রচণ্ড করতালির শব্দ শুনে সেই দিকে এগিয়ে যেতেই দেখলাম চেয়ারম্যান মাও ঢুকে পড়েছেন, আমন্ত্রিতরা উঠে দাঁড়িয়ে করতালি ধ্বনিদ্বারা সম্মান ও সন্তোষ জ্ঞাপন করছেন। চৌ এন-লাই তাঁর অতিথিদের এবং রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে অগ্রসর হবার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে অগ্রসর হলাম।

চেয়ারম্যান মাও ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চতুর্থ লাইনে একখানি আসনে উপবেশন করলেন, তাঁর পাশে বসলেন সারা চীন পীস্-কমিটির সহ-সভাপতি চেন স্থ-তুঙ। আর প্রথম লাইনে চৌ এন-লাই বাঁদিকে রাষ্ট্রদূতকে আর ডান দিকে প্রতিনিধিদলের নেতাকে নিয়ে বসলেন। প্রতিনিধি-নেতার ডানদিকে বসলেন মহাকবি ভাল্লাথল, বিলায়েত হুসেন খাঁ, মীরাবাঈ বরদাকর আর প্রতিনিধিদলের সম্পাদক কলিমুল্লা খাঁ। বিলায়েত খাঁর আর মীরাবাঈয়ের প্রোগ্রাম প্রথমার্ধে ছিল না। প্রোগ্রাম শুরু হলো। এই ঘটনার আগে পর্যন্ত আমরা কেউ জানতাম না যে চেয়ারম্যান মাও আমাদের গান শুনবেন, নাচ দেখবেন। গানের স্বরূপ ও বিষয়বস্তুর মর্ম মুদ্রিত প্রোগ্রামে চীনা-ভাষায় তর্জমা করা ছিল, ঘোষক বলে বলে দিচ্ছিলেন। তবুও মাঝে মাঝে চৌ এন-লাই দু'চারটি প্রশ্ন করছিলেন। দেবব্রত সেদিন গাইলেন সুকান্তর অবাক-পৃথিবী। গানটি চমৎকার গাইলেন। কথা-প্রসঙ্গে আমি দেবব্রতর কথাও চৌ এন-লাইকে জানালাম, সুকান্তর

মতো প্রতিভার অত অল্প-বয়সে মৃত্যুর কথাও শোনালাম। চৌ এন-লাই কণ্ঠে অত্যন্ত দরদ নিয়ে বল্লেন—"বিপ্লবীদের নানা দুঃখ, অকালমৃত্যু তার একটা।" বিলায়েতের সেতার, হীরাবাঈয়ের গান, দময়ন্তীর কথক নাচ, চন্দ্রলেখার ভারত-নাট্য, দিলীপ শর্মার আসামী গান তাঁকে আনন্দ দিল বলে মনে হল। শেষ অনুষ্ঠানটির আগে যথারীতি আমাকে ভিতরে যেতে হল। অনুমতি নিয়ে উঠে গেলাম। নিয়ম, প্রোগ্রাম শেষ হতেই নেতাকে তাঁর দলের সকল শিল্পীকে নিয়ে মঞ্চে দাঁড়াতে হবে আর এই উনত্রিশটি লোককে উনত্রিশটি তরুণ-তরুণী পুষ্প-স্তবক উপহার দেবেন। তখন প্রেক্ষাগৃহের সকলে উঠে দাঁড়িয়ে করতালি ধ্বনি করে শিল্পীদেরকে অভিনন্দন জানাবেন। চেয়ারম্যান মাও, প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই, চীন-রাষ্ট্রের সকল প্রধান প্রধান কর্মী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এ-রীতির ব্যতিক্রম হল না। সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিতে লাগলেন। অবশেষে যবনিকা পড়ল।

শিল্পীরা ব্যাঙ্কোয়েটের জন্য প্রস্তুত হতেই আমাদেরকে যখন আবার প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন দেখলাম অতবড় প্রেক্ষাগৃহ একেবারে শূন্য—চেয়ারম্যান মাও কখন যেন চলে গেছেন, অন্যান্য আমন্ত্রিতরা ব্যাঙ্কোয়েট-হলে গিয়ে বসেছেন। হলের দরজায় চৌ এন-লাই অপেক্ষা করছেন। তাঁর ডাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রদূত। আমি গিয়ে চৌ এন-লাইয়ের বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে ডেলিগেটদের পরিচয় দিতে লাগলাম, তাঁরা একে একে হলে ঢুকে নিজ-নিজ আসনে বসতে লাগলেন। প্রত্যেক টেবিলেই নাম লেখা থাকে কে কোথায় বসবেন এবং প্রত্যেক টেবিলেই একজন করে ছেলে বা মেয়ে দোভাষী এবং গায়ক নর্তক অভিনেতা বা অভিনেত্রী থাকবেন। দেবব্রতর সঙ্গে করমর্দন করবার সময়



মাও সে-তুঙের সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার

ভারতীয় প্রতিনিধি দল



দিল্লী থেকে যাত্রার প্রাক্কালে

চৌ এন-লাই হেসে বল্লেন—"আপনি তো রেভলিউশনারি গান শোনালেন।" সকলে উপবিষ্ট হবার পর চৌ এন-লাই একদিকে প্রতিনিধি-দলের নেতা আর অপরদিকে রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে হলে ঢুকলেন, পাঁচশত নিমন্ত্রিত উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। এও চীনের ভদ্রতা ও শিষ্টাচার প্রকাশের রীতি। সকল ব্যাঙ্কোয়েটেই এই হয়। চৌ এন-লাই আমাদের নিয়ে তাঁর টেবিলে বসালেন। মাঝখানে তিনি, তার বাঁ দিকে প্রতিনিধিদের নেতা, সেই ভোজের প্রধান অতিথি, ডানদিকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সহধর্মিণী, তাঁর ডানদিকে আপ্যায়ন-কর্ত্রী তাঁর ডানদিকে মহাকবি ভাল্লাথল। প্রতিনিধিনেতার বাঁ দিকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর বাঁ দিকে দোভাষী—এ-ক্ষেত্রে একজন শক্তিমতী মহিলা।

প্রারম্ভেই চৌ এন-লাই প্রধান-অতিথিকে এবং ডেলিগেশনের সকল সদস্যকে চায়না গণ-প্রজাতান্ত্রিক গবর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে এবং জনগণের পক্ষ থেকেও সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তারপর তিনি অতীতের ভারত-চীনের বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করলেন। চীন-সংস্কৃতি কোন ধারা বয়ে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছিল তাও আলোচনা করলেন। ভারতের সংস্কৃতি-স্পর্শে অতীতে চীন কি ভাবে উপকৃত হয়েছিল, তারও হদিস দিলেন। দেশে দেশে সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলতে থাকলে এবং পৃথিবীর শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলে যে মানুষ আজকার দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে পারে, সে-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ তাও শোনালেন। তিনি বল্লেন ভারতের ওপর তাঁদের অনেক ভরসা। চীনের সৌভাগ্য ভারত চীনকে নিরাশ করেনি। কেবল শান্তি-সংগ্রামেই নয়, নতুন চীনের মর্যাদা রক্ষার জন্যও ভারত চীনকে নিরাশ করেনি। কেবল শান্তি-সংগ্রামেই নয়, নতুন চীনের মর্যাদা রক্ষার জন্যও ভারত চীনকে সমর্থন করে চলেছে।

চীন-ভারত মৈত্রী এশিয়ার সঙ্কট মোচন করবে, এশিয়ায় আজও যারা হামলা করছে তাদেরও চৈতন্যসঞ্চারে সক্ষম হবে। চীন আর ভারত যে পরস্পরকে বুঝতে চায় তারই নিদর্শন হচ্ছে এই প্রতিনিধিদল। এই রকম প্রতিনিধিদল দুই দেশে যাতায়াত করতে থাকলে উভয়ের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হবে, উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হবে। ডেলিগেশনের সদস্যদেরকে পুনরায় সাদর-সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। তিনি বক্তৃতা করেছিলেন তাঁর মাতৃভাষায়। ডেলিগেশনের সদস্যদের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজি তর্জমা পড়ে শোনানো হয়। চীন-দেশের কোন নায়ক কখনো ইংরিজি ভাষায় বক্তৃতা করেন না, যিনি ইংরিজি খুব ভাল বলতে বা লিখতে পারেন, তিনিও না।

প্রধান মন্ত্রীর ভাষণের পর প্রধান অতিথিকে তাঁর বক্তব্য বলতে হয়। তাতেও চীন-ভারতের অতীত-বন্ধুত্বের কথা বলা হয়, নবচীনের অভ্যুদয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল শিক্ষিত লোককে কিরূপ বিস্মিত করেছে তা প্রকাশ করা হয়। বলা হয়, কি করে এই বিস্ময়কর অভ্যুদয় সম্ভব হল তা বোঝবার প্রয়োজনও এই ডেলিগেশন প্রেরণের অন্যতম কারণ, রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সঙ্কট' থেকে বচন উদ্ধৃত করে বোঝানো হয় পৃথিবীর বর্তমান সংঘর্ষ দুইটি পৃথক সভ্যতারই সংঘর্ষ। বলা হয় প্রাচীন সভ্যতার সঙ্কট থেকেই নতুন সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে। সেই নতুন সভ্যতার বনিয়াদ হচ্ছে জনগণ। এই জন-কে ভারত একদিন সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিল। সে-দিন তার সকল সৃষ্টিই সফল হয়েছিল, সার্থক হয়েছিল। পরবশতা ভারতকে এই জনগণের প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত করে তুল্ল—পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতকে তার ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিল। কিন্তু ভারত প্রাচ্যের দেশ, যে প্রাচ্যে সূর্যের উদয় হয়। চীনও প্রাচ্য দেশ। এই দুই প্রাচ্য দেশ নিজ-নিজ সংস্কৃতির আলো ঢেলে, আদান-প্রদান দ্বারা উজ্জ্বলতর

হয়ে বর্তমানের ঘন-তমসা দূর করবে। যেমন সার্থক হবে চীন প্রজাতন্ত্র, তেমন সার্থক হবে ভারত প্রজাতন্ত্র এবং কেউ কাউকে মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত করবার চেষ্টা না করে প্রীতি দিয়ে স্বীকৃতি দিয়ে যে আলো জ্বেলে তুলবে, তাতে করে বিশ্বের জনগণের কল্যাণ হবে। মোটের ওপর রবীন্দ্রনাথের শেষ টেস্টামেণ্টই তিনি ভারতের হয়ে নয়া চীনের কাছে উপস্থিত করলেন। প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য কামনা প্রকাশ করে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর লিখিত বক্তৃতাটি আগেই চীনা-ভাষায় অনুবাদ করে রাখা হয়েছিল। তাঁর ভাষণের সঙ্গে সঙ্গেই মহিলা দোভাষীটি তর্জমা পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিলেন।

তারপরই শুরু হল সকলের খাবার পালা। ওখানকার নিয়ম হচ্ছে অতিথির ডিশে খাদ্য তুলে দেওয়া। চৌ এন-লাইও রাশি রাশি খাবার আমার ডিশে তুলে দিতে লাগলেন। আতঙ্কে বলে ফেল্লাম—"একি করছেন, ইওর একসেলেন্সি!"

হেসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"অন্যায় কিছু করলাম কি?"

অপ্রতিভ হয়ে বল্লাম—"তা বলবার দুঃসাহস নেই। আমার পেটের স্থিতিস্থাপকতা ভেবে ভয় পাচ্ছি।"

তিনি বল্লেন—"দেখুন, আপনি আমার অতিথি। আমার কাজ হচ্ছে চীনের ভালো-ভালো খাবার আপনার ডিশে তুলে দেওয়া। আর আপনার কাজ হচ্ছে সবগুলো চেখে দেখে যে-গুলো ভালো লাগবে না, তা ফেলে রাখা। আর যেগুলো ভাল লাগবে, সেগুলো খেয়ে ফেলা। ভোজে এ-ছাড়া আর কিছু ভাববার নেই।"

"অপচয়ের কথা?" জিজ্ঞাসা করতে ছাড়লাম না।

সপ্রতিভভাবে তিনি বল্লেন—"কিছু অপচয় করবার মতো খাদ্য না থাকলে কি আর নিমন্ত্রণ করি?" বলেই তিনি হেসে উঠলেন এবং দূরে একটি গায়িকা-অভিনেত্রীর নাম ধরে চীৎকার করে ডেকে তাঁর দৃষ্টি

আকর্ষণ করে বল্লেন—"আর খেতে হবে না, উঠে এস, উঠে এস।" প্রধান মন্ত্রীর আদেশ। তিনি উঠলেন, হেলে দুলে চলে এলেন টেবিলের সামনে। প্রধানমন্ত্রীও আদেশ করলেন—"আমার ভারতীয় বন্ধুদের একটা গান শোনাও।"

"গান এখন ভালো হবে না, গলাটা আমার আজ ভালো নেই"—আবদার করে তিনি বল্লেন।

প্রধানমন্ত্রীও ছাড়বেন না। তিনি বল্লেন—"ওই গলাতেই হবে। এঁরা সব গুণী লোক। কতখানি তোমার গলার দোষ, আর কতটা দোষ গাওয়ার, তা এঁরা বুঝতে পারবেন।"

আর আপত্তি চলে না। গাইলেন তিনি। চমৎকার গাইলেন। হাজার হাতের করতালিদ্বারা তিনি অভিনন্দিত হলেন। প্রায় ছুটে গিয়ে তিনি তাঁর টেবিলে বসলেন। খাওয়া চলতে লাগল।

খেতে খেতে আমি বল্লাম—"অল ইণ্ডিয়া পীস্ কাউন্সিল আমাকে বলে দিয়েছেন আপনাদেরকে অনুরোধ করতে যে, আগামী শীতকালে চীন থেকে আমাদের ডেলিগেশনের মতো একটি ডেলিগেশন ভারতে পাঠাতে।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কি রকম ডেলিগেশন হলে ভালো হয় মনে করেন?"

জবাবে আমি বল্লাম—"আপনাদের সমবেত কণ্ঠের আধুনিক গান আর সমবেত লোকনৃত্য আর আধুনিক নৃত্যগুলি আমাদের খুব ভালো লেগেছে। ভারতবর্ষের ভালো লাগবে। সঙ্গে একটি এক্রোবেটিক ট্রুপ (খেলোয়াড় দল) থাকলে আরো ভালো হয়।"

"সব সমেত যে শ-দেড়েক লোক পাঠাতে হয়।"

আমাদের রাষ্ট্রদূত বল্লেন—"আজই এই মর্মে আমিও ভারত-সরকারের এক টেলিগ্রাম পেয়েছি।"

চৌ এন-লাই বল্লেন—"একদিন যাবেই এ-দেশের শিল্পীরা।" তার পরই একজন গায়কের নাম ধরে ডেকে তাঁকে বল্লেন উঠে এসে গান শোনাতে। এলেন তিনি। গান শোনালেন। আবার হাজার হাতের করতালি। এই রকম মাঝে মাঝে খাওয়ায় মন দেওয়া আর মাঝে মাঝে গান শোনা। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, বোঝা গেল, সকল নামকরা শিল্পীকেই ব্যক্তিগতভাবে জানেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্বন্ধ। অবশ্য পোলিটিকাল কন্‌সাল্‌টেটিভ কমিটিতে এবং গবর্নমেণ্টের নানা-বিভাগে শিল্পী কর্মীর সংখ্যা বড় কম নয়।

রাত প্রায় দেড়টায় ভোজ-পর্ব সমাপ্ত হলো। প্রধানমন্ত্রী দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন—প্রাচীন ভারতের প্রত্যুদ্‌গমন, চীনেরও চিরন্তন-রীতি। নয়া-চীন তা বর্জন করেনি।

আর একটি দিন

"আজ আমাদের জনগণ এই কথা বলবার অধিকার অর্জন করেছে যে, আমরা আমাদের কাজ দিয়ে আমাদের এই মাতৃভূমিকে পৃথিবীর অন্যতমা শ্রেষ্ঠা শক্তশালিনী, সৌন্দর্যময়ী এবং বরণীয়া বাসভূমি করে গড়ে তুলতে সক্ষম হব। আমরা সেই প্রবলতর কর্মস্রোতে ঝাঁপ দেবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, যা স্বল্প কয়েক বছরেই আমাদের এই চীনকে শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের এই নতুন জন-রাষ্ট্রের নব-নব প্রয়াস নিশ্চিতই সফল হবে। আমাদের মনে মালিন্য নেই, দুর্যোগকে জয় করবার শক্তি আমাদের আছে, আমাদের মাতৃভূমি আমাদের জন্য প্রকৃতির দেওয়া নানা সম্পদ সঞ্চয় করে রেখেছে, নানা জাতির সহায়তা ও শুভেচ্ছা হয়ে উঠেছে আমাদের স্মরণীয় ও বরণীয় সম্পদ। নিঃসন্দেহে এ-কথা আজ আমরা বলতে পারি যে, আমাদের এই জন-রাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নয়া-চীনের নতুন আদর্শের নব রূপ আরোপে নিশ্চিতই আমরা সক্ষম হব। ব্যক্তিগত ভাবে পিপলস রিপাবলিক সম্বন্ধে এ-কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলবার অধিকার আমি রাখি এই কারণে যে, গত তিন বছরে আমি বহুবার দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পরিভ্রমণ করেছি। আমি জনগণের সঙ্গ পেয়েছি; তাদের ঘরে বসে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা তাদেরই মুখ থেকে শুনেছি; তাদের ক্ষেতে-খামারে তাদের কাজ দেখতে দেখতে তাদের জীবন নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি; তাদের পাঠ-চক্রে আমি যোগ দিয়েছি; তাদের খেলার মাঠে উপস্থিত থেকে তাদের ক্রীড়া-কৌতুক আমি উপভোগ করেছি। আমি দেখেছি তারা আদালত পরিচালনা করছে, আইন তৈরি করছে, দেশের সর্বোচ্চ শাসন-প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন স্তরের গ্রাম্য-প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সর্বত্রই

তারা অনুপম নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করছে। তাদের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে, তাদের কণ্ঠের ভাষা শুনে, তাদের মুখের প্রসন্নতা দেখে আমি এই প্রত্যয় নিয়ে এসেছি যে, তারা চায় শান্তি, তারা চায় শক্তি, তারা চায় কাজ করবার নিরুপদ্রুত অবসর। নতুন চীনকে জানতে হলে, নতুন আর পুরাতন চীনের পার্থক্য বুঝতে হলে, এই জনগণকেই জানতে হয়, বুঝতে হয়। তিন বছর দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে এই পরিচয়ই আমি পেয়েছি যে, আমাদের জনগণের চিত্তে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে, নব বোধের উদয় হয়েছে, নব পরিণতির পথে অগ্রসর হবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে।"

ওই বলবতী আশা, ওই দৃঢ় প্রত্যয়, জাতির জনগণের সঙ্গে ওই নিবিড় পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে বর্তমান চীনের সর্বশ্রেষ্ঠা নারী-নেত্রী, পিপলস্ রিপাবলিকের অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান সুঙ চিঙ-লিং, অর্থাৎ মাদাম সান ইয়েত-সেনের ভাষণে। ও ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন ১৯৫২ সালে পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত 'এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি-সম্মেলন'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে। নয়া চীনের যে পরিচয় মাদাম পেয়েছেন, সে পরিচয় পাবার সুযোগ যে আমাদের হয়নি তা বলা বাহুল্য। তবুও তাঁর ভাষণ উদ্ধৃত করে আলোচনা শুরু করছি এই কারণে যে, আমি ভাবতেই পারিনা তাঁর মতো একজন সর্বজনবরেণ্যা মহিয়সী মহিলা পৃথিবীর নানা দেশের সমবেত জ্ঞানী ও গুণী বিদগ্ধদের সামনে দাঁড়িয়ে অসত্য উক্তি করেছেন। তাঁর এই ভাষণকে আমি তো মিথ্যা মনে করি-ই না, অতিরঞ্জন মনে করবারও কারণ খুঁজে পাইনা।

সুঙ চিঙ-লিং কমিউনিস্ট কিনা তা আমি জানিনা। কাউকে তা জিজ্ঞাসাও করিনি; তাঁকে তো নয়ই। চীনে যাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, তাঁরা কোন দিনই জানতে চাননি আমাদের রাজনৈতিক মতবাদ কি। আমরাও ও-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা সঙ্গত মনে করতাম না। তাঁরা অবশ্য তাঁদের নব-সৃষ্টির পরিচয় দেবার সময়

সর্বদাই চেয়ারম্যান মাও এবং কমিউনিস্ট পার্টির অনুপম নেতৃত্বের উল্লেখ করতেন। জানতাম তাঁদের পক্ষে তাই করাই স্বাভাবিক। প্রত্যক্ষও করতাম ওই নেতৃত্বের সুফল। সুঙ চিঙ-লিং তাঁর স্বামীর বৈপ্লবিক কুয়োমিনতাঙ বর্জন করেননি, নয়া চীনও তা করেনি। চিয়াং কাই-শেক কুয়োমিনতাঙের যে প্রতিক্রিয়াশীল রূপ দিয়েছিলেন, নয়া চীন ঢাকী সহ তাকেই বিসর্জন দিয়েছে, বিপ্লবী কুয়োমিনতাঙকে নয়। সান ইয়েত-সেনের স্মৃতি আর তাঁর বিশ্বমানবের মুক্তি ও মৈত্রীর আদর্শ নয়াচীনের সর্বত্রই সম্মানিত।

ডাক্তার সান ইয়েত-সেন এককালের বাঙালী যুবজনের প্রেরণার উৎস ছিলেন। সে-কালের বিপ্লবীদের 'এক দল সান্ ইয়েত-সেনের প্রধান কর্মকেন্দ্র সাংহাইতে বিপ্লবের একটি শাখা-কেন্দ্রও স্থাপন করে-ছিলেন। সেই সময়ে সান ইয়েত-সেনের বাণী ও কর্ম-বিবরণী বাংলার যুব-সমাজে প্রচারিত হোতো, আলোচিত হোতো। তখনকার সকল বিপ্লববাদীদের মতো আমিও সান ইয়েত-সেনকে পরম শ্রদ্ধার পাত্র বলেই গ্রহণ করি—যেমন করি ম্যাটসিনিকে, গ্যারিবল্ডিকে, বাইরনকে, বার্ককে, শেলীকে, হুগোকে, আব্রাহাম লিঙ্কনকে, বুকার টি ওয়াশিংটনকে, ফরাসী বিপ্লবের নায়কদেরকে, রুশ সাহিত্যিকদেরকে, য়্যাডমিরাল টোগোকেও। রাজনীতিতে তখন মাত্র দুটি 'ইজম' ছিল—ইম্‌পীরিয়ালিজম আর পেট্রিয়টিজম---সাম্রাজ্যবাদ আর দেশপ্রেম। আমরা তখন বন্ধন-বেদনায় কাতর। তাই যে-দেশে যে-জননায়ক বন্ধন-মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন, সেই দেশের সেই জন-নায়কের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। আজকার দিনেও যাঁরাই সাধারণ মানুষের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রচনা করে চলেছেন, তাঁদেরও উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধন্য হই, মনে করি ঋণ স্বীকার ওতেই হয়। আমাদের এই স্বীকৃতি সবার ভালো লাগে না। কেননা আজ অসংখ্য 'ইজম' জনমনের আনুগত্য

দাবি করে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত। সকল দেশের সকল রাষ্ট্র-নায়কই মানুষকে বিচার করেন তাঁদের নিজ-নিজ ইজমের প্রিজম দৃষ্টির সম্মুখে ধরে। আমরা রাষ্ট্র-নায়ক নই, সাধারণ সিটিজেন, লেখন-ইণ্ডাষ্ট্রির শ্রমিক। আমরা কোন ইজমকে অবাস্তব মনে করে উপেক্ষা করি না। কেননা নিরপেক্ষ মন নিয়ে আমরা দেখে এসেছি মানুষ একটা 'ইজম' অবলম্বন করে আত্ম-প্রকাশ করেছে এবং আত্ম-পরিণতির তাগিদেই তা ত্যাগ করে আর একটা 'ইজম' অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে। ফিউডালিজম, ইমপীরিয়ালিজম, পেট্রিয়টিজম, ন্যাশনালিজম, কমিউনিজম, সোশ্যালিজম, হিউম্যানিজম্, প্রভৃতির কোনটারই উদ্ভব মানুষের নিছক খেয়াল থেকে হয়নি—হয়েছে সাময়িক প্রয়োজন থেকে, হয়েছে অপূর্ণতাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হবার আগ্রহ থেকে। পিকিং মিউজিয়ামে কনফিউসাসের প্রতিকৃতির নীচে বড় বড় করে যা লেখা রয়েছে, তার এই তাৎপর্য—কনফিউসাস ফিউডালিজম্ (সামন্ততন্ত্র)-এর ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছিলেন, ফিউডালিজম্‌কে তিনি মর্যাদাও দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকে কেবল ওইটুকু মনে রেখেই তাঁর বিচার আমরা করব না। ফিউডালিজম্ তার কাজ শেষ করে আমাদের দেশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। আজ তা অবাস্তব। কিন্তু কনফিউসাস মানব-মঙ্গলের যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তা আমরা সসম্মানে স্মরণ করব। কেননা মানব-মঙ্গলই আমাদের পরম সাধনা। এমন কথা সান ইয়েত-সেন সেই দূর অতীতেও আমাদের শুনিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণী এবং সহকর্মিণীর নানা বাণীও আমাদের কানে এসে পৌছুতো। তাই দূর থেকে তাঁরও উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করে এসেছি। দূরে থেকেও নয়া-চীন সম্বন্ধে তাঁর নানা ভাষণ পড়ে মনে হয়েছে তা অবাস্তব নয়। চীনে গিয়ে জেনে এলাম তাঁর ভাষণে প্রতিফলিত নয়া-চীন তাঁর কল্পনা নয়, বাস্তব সৃষ্টি।

আমরা যখন পিকিংয়ে ছিলাম, সুঙ চিঙ-লিং তখন সেখানে ছিলেন না; শুনেছিলাম তিনি নানকিংয়ে। নানকিংয়ে যাবার পর জানলাম তিনি সাংহাইতে। সাংহাই গিয়ে নিশ্চিত করে জানলাম সেইখানেই তিনি আছেন এবং আমাকে আর ডেপুটি-লীডার মহাকবি ভাল্লাথলকে তিনি স্বাগত জানাবেন। সাংহাইতে আমাদের প্রদর্শনীর উদ্বোধন-ভাষণ শেষ করে মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহে নেমেই দেখতে পাই তৃতীয় পংক্তিতে বসে আছেন চীনা গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের সহ-সভাপতি সুঙ চিঙ-লিং। মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখি। তাঁর এত ছবি দেখেছি যে, চিনতে দেরি হবার কথা নয়। কিন্তু কাছে গিয়ে তখন শ্রদ্ধা নিবেদন রীতি-সম্মত নয়। তাই আমার জন্য সংরক্ষিত আসনে, প্রথম পংক্তির কেন্দ্রস্থলে সাংহাইয়ের সাহিত্যিকদের শিল্পীদের নিয়েই আমাকে বসতে হোলো। বিরতির সময় আমাকে সর্বত্রই আমার জন্য রক্ষিত নির্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হোতো। বিরতি-অন্তে পুনরায় প্রেক্ষাগৃহে স্থান নিতাম। সেদিন অভিনয় শেষ হবার পর হোটেলে ফিরে আমাদের প্রতিনিধিদলের স্বনামধন্য শিল্পী বিলায়েত হুসেন খাঁর মুখে শুনলাম বিরতির সময় তিনি যখন প্রেক্ষাগৃহে গিয়েছিলেন, তখন একটি মহিলা তাঁকে ডাকিয়ে নিয়ে তাঁর মাথায় হাত দিয়ে তাঁকে নীরবে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। বিলায়েৎ সেদিন বিরতির আগেই সেতার বাজিয়েছিলেন। বিলায়েৎ খাঁর বিশ্বাস তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং সুঙ চিঙ-লিং। চীন যাবার পথে আমি বিলায়েৎ খাঁকে প্রায়ই বলতাম —তুমি চীনের চিত্তজয় করে ফিরবে। সত্যই বিলায়েৎ খাঁ তাঁর অনুপম শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সেখানে সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠে-ছিলেন। সুঙ চিঙ-লিং যেদিন আমাদের দেখা দেন, সেদিন আমাদের

শিল্পীদের সুখ্যাতি প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে বিলায়েৎ খাঁর সেতারেরই উল্লেখ করেন। সেই দিনটির কথাই বলি।

সকাল বেলাতেই চায়না পীস কমিটির সংযোগরক্ষাকারী অফিসার মিঃ উ (যিনি সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকতেন) জানালেন যে, অপরাহ্ন চারটার সময় ভাইস চেয়ারম্যান সুঙ চিঙ-লিং ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা আর ডেপুটী নেতাকে (মহাকবি ভাল্লাথল) স্বাগত জানাবেন। যথা সময়ে আমরা রওনা হলাম। অতিরিক্ত তৃতীয় ভারতীয় আমাদের সঙ্গে রইলেন মহাকবির পুত্র বালকৃষ্ণ, পিতার দোভাষী হিসেবে। লিয়াজঁ অফিসার মিঃ উ এবং চীন-দোভাষী মিঃ ঠাং-ও আমাদের সঙ্গে রইলেন।

আমাদের গাড়ি সাংহাইয়ের অনেক রাস্তা ঘুরে একটি নির্জন পল্লীর বাগান-ঘেরা বাংলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ছোট্ট বাংলোটি ঘিরে নানা ফল-ফুলের বাগান। গাড়ি থেকে নামতেই আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন মাদামের সেক্রেটারি, সুহাস এক ভদ্রলোক। সকলকে সাদরে তিনি নিয়ে গেলেন বসবার ঘরে। ঘরের মাঝখানে মাদাম দাঁড়িয়ে ছিলেন, পল্লী-রমণীদের পোষাক পরিহিতা। হেসে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আসন দেখিয়ে দিলেন। কোণ-ঘেঁষে রাখা সোফা-সেটিতে আমরা সকলে বসলাম বড় একটা টিপয় ঘিরে। টিপয়ের ওপর চা, কেক, নানা রকম খাবার। মাদাম ডিশে ডিশে খাবার তুলে দিতে দিতে কথা বলতে লাগলেন, অবশ্য চীনে ভাষায়। আমাদের সঙ্গীত ও নৃত্য তাঁর ভালো লেগেছে। বিলায়েৎ খাঁর সেতারের সুখ্যাতি করে তিনি বল্লেন চীনেও নানা রকম তারের বাদ্যযন্ত্র আছে। আমি বল্লাম—"তিনজিন কনজারভেটরিতে আমরা অনেকগুলি যন্ত্র দেখেছি। সেখানকার ওস্তাদরা সেগুলি বাজিয়েও আমাদেরকে শুনিয়েছেন।"

—"আমাদের অভিনয় কিছু দেখেছেন?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

—"সব জায়গাতেই দু'টি একটি করে দেখেছি, সবই অপেরা।"

—"পিকিং অপেরা-শ্রেণীর অপেরা দেখেছেন ?"

—"পিকিংয়েই দেখেছি, ভালোও লেগেছে।"

—"ভালো লাগল ?"

—"হ্যাঁ। বড় সুন্দর প্রকাশ-ভঙ্গি। বিষয়বস্তুতে এবং টেক্‌নিকে আমাদের পৌরাণিক গীতাভিনয়ের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।"

—"আমাদের অপেরার গান ?"

—"আমাদের গুণী-গায়করা বলেন ভারতীয় রাগের চার-পাঁচটি রাগের আভাস তাঁরা আপনাদের অপেরার গানে পেয়েছেন। দুটি তালেরও সাদৃশ্য পেয়েছেন।"

—"কতদিন ধরে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান চলেছিল আমাদের দুই দেশে!" বলে তিনি মহাকবির ডিশে আরো কিছু খাবার তুলে দিলেন।

মহাকবি হেসে বল্লেন—"চীনে এসে হতবাক্ হয়েছি। তাই নিঃশব্দে খেয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি। মালায়লম ছাড়া আর কোন ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে পারিনা বলে মনের স্বতঃস্ফূর্ত কৃতজ্ঞতা ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে নিবেদন করতে পারি না।"

মাদাম বল্লেন—"আমরা বুঝি আপনি নয়া-চীনকে ভালোবাসেন। নইলে কি এই বয়েসে এত কষ্ট করে আপনি এখানে ছুটে আসতেন ?" মহাকবি প্রীত হলেন। সত্যি, চুয়াত্তর বছর বয়েসে ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশ থেকে চীনে ছুটে যাওয়া কম কথা নয়। তিনি মস্কোতেও গিয়েছিলেন। গণ-নারায়ণের প্রতিষ্ঠা যেখানে হয়, সেই জায়গাকেই তিনি মানবের তীর্থ-ক্ষেত্র মনে করেন। পিকিংয়ে তাঁর এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন—"ভল্‌গা, ইয়াংসি, আর গঙ্গা একত্র হয়ে মানব-প্রীতির বন্যা বহিয়ে অমানুষিকতা ভাসিয়ে দেবে।" সকল মানুষের

মুক্তি ও মৈত্রী, সকল অমানুষিকতার ও বিরোধের অবসান দেখবার জন্য মহাকবি আজ ব্যাকুল। এই পৃথিবী থেকে চির-বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে তিনি তারই সূচনা দেখে যেতে চান।

আমাদের আলোচনা ঘুরে ফিরে আবার সঙ্গীতেই এলো।

আমি জানতে চাইলাম—"আমাদের ক্লাসিকাল গান কেমন লাগল?"

—"বেশ ভালো লাগল।" তিনি বল্লেন। একটু থেমেই তিনি তাঁর উক্তির সঙ্গে জুড়ে দিলেন—"কিন্তু কেন ভালো লাগল, তা যেন জিজ্ঞাসা করে বসবেন না।"

—"আমার পরবর্তী প্রশ্ন তো তাই-ই ছিল।" আমি নিবেদন করলাম।

—"খুবই স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ সঙ্গত। কিন্তু কি জানেন, আমি সুরজ্ঞ নই। তবে হীরাবাঈয়ের গান কেন যেন আমার মর্ম-স্পর্শ করেছিল। নাচেও অনেক নতুন ভঙ্গি পেলাম।" বলেই তিনি একটা সরবতের গ্লাস হাতের কাছে এগিয়ে দিলেন।

এক চুমুক খেয়েই বল্লাম—"বাঃ! চমৎকার!"

—"ভালো লাগছে?" তিনি জানতে চাইলেন।

—"খুব।" বলেই আর এক চুমুকে অনেকখানি খেয়ে ফেল্লাম।

মাদাম বল্লেন—"আজ সকাল থেকে কেবলই ভাবছিলাম আপনা-দেরকে কি খেতে দি।" সামনের ডিশ-ভর্তি খাবার দেখিয়ে বল্লেন—"এসব তো রোজই খাচ্ছেন আপনারা। হঠাৎ মনে হোলো এই সরবৎটা আপনাদের ভালো লাগতেও পারে। আমার বাগানেই গাছ আছে। পাতা তুলে এনে নিজেই এই সরবৎ তৈরি করলাম। আমার কেন যেন মনে হয়েছিল আপনাদের ভালো লাগবেই। ভালো লেগেছে জেনে সত্যিই আনন্দ পেলাম।"

তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখে বলে ফেল্লাম—"আপনি ঠিক বাঙালী মায়ের মতোই কথাটি বল্লেন।"

তিনি হেসে বল্লেন—"সব মায়েরাই সন্তানদের কাছে একই ভাষায় কথা বলে।"

—"সত্যিই তাই।" স্বীকার করলাম।

মাদাম এবার জিজ্ঞাসা করলেন—"আমাদের সামাজিক অপেরা Buddha's Coin দেখেছেন ?"

—"নানকিংয়ে দেখেছি। বড় ভালো লেগেছে। যেমন পেলাম নাটকীয়তা, তেমন দেখলাম অভিনয় নৈপুণ্য। মায়ের ভূমিকা অভিনয় করলেন যে অভিনেত্রীটি, ইয়েন চেং তাঁর নাম, খুবই শক্তিমতী অভিনেত্রী।"

—"আমি দেখেছি ওই অভিনয়। মেয়েটি বেশ অভিনয় করে।"

—"আমি তাঁর কাছে একটি ভূমিকা অভিনয়ের প্রস্তাব করে এসেছি!"

—"কি বলুন তো ?"

—"আমি তাঁকে বলেছি যে-ভূমিকা অভিনয় করে তিনি আমাদেরকে দেখালেন, তার চেয়েও বড় ভূমিকা অভিনয় করবার শক্তি তাঁর আছে। যদি তিনি গোর্কির মা অভিনয় করেন, তাহলে খুব নাম করতে পারবেন।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, গোর্কির মা। উপন্যাসখানার তর্জমা আছে। কিন্তু তার নাট্যরূপ আছে কিনা ঠিক জানিনা।"

আমি জানালাম, বাংলায় ওই উপন্যাসখানিকে নাটকে রূপান্তরিত করে অভিনয় করা হয়েছে।

তিনি বল্লেন—"আবার যখন নানকিংয়ে যাব, আমি খোঁজ নোব। ওর নাট্যরূপ না থাকলে কাউকে দিয়ে তা করিয়ে নিতে বলব। মেয়েটি ওই মায়ের ভূমিকা ভালোই অভিনয় করবে।"

"কিন্তু সত্যিই যদি সেই অভিনয় হয়, চায়না পীস্ কমিটিকে আবার কিছু খরচা করতে হবে।" আমি জানালাম।

"কেন, বলুন তো?" কৌতুহলভরা তাঁর প্রশ্ন।

প্রশ্রয় পেয়ে আমি বল্লাম—"চেন ইয়েং আমাকে বলেছেন মা যেদিন তিনি অভিনয় করবেন, সেদিন আমাকে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থাকতে হবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছি!"

"চায়না পীস্ কমিটি বন্ধুদের সঙ্গে মেলবার স্থযোগ কখনো উপেক্ষা করবেনা।" বলে তিনি হাসলেন।

আমি বল্লাম—"ডাক্তার সান ইয়েত-সেনকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য কখনো হয়নি। নানকিংয়ে তাঁর সমাধি এবং পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি দেখে ধন্য হয়েছি।"

—"বাঙলায় আমার স্বামীর অনেক বন্ধু ছিলেন আমি জানি। এখনো কেউ কেউ আছেন নিশ্চিত। জাপানে বোসের (রাসবিহারী) সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।"

—"আজ তিনি জীবিত নেই।"

—"কিন্তু যে জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তা আপনারা পেয়েছেন।"

—"হ্যাঁ, আমরা আজ স্বাধীন।"

কথা ঘুরিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আমাদের পুরোনো বাড়িটা দেখেছেন?"

—"না। এখনো স্থযোগ হয়নি।"

—"যাবার আগে একদিন দেখে যাবেন। তাঁর স্টাডি, তাঁর লাইব্রেরি, তাঁর সংগৃহীত নানা জিনিস সেখানে দেখতে পাবেন। আমি আর সে বাড়িতে থাকি না।" কণ্ঠ যেন একটু কেঁপে উঠল।

একটুকাল চুপ করে থেকে আমি বল্লাম—"মাদামের অনেক সময় নষ্ট করলাম। অনুমতি পেলে এখন উঠতে পারি।"

—"কিন্তু বিচ্ছেদের আগে মিলনের একটা ছবি তুলে রাখতে হবে যে!"

ইচ্ছাটা আমারো খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা ব্যক্ত করা অশোভন, এমন কি, অশিষ্টতাও হবে, মনে করেই প্রস্তাব করিনি। তিনি নিজেই ফটো তোলবার প্রস্তাব করতে উৎফুল্ল হয়ে বল্লাম—"এই সম্মান দেবার জন্য মাদামের কাছে আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।"

"ছবিখানা চিরদিন আমার এই ঘরেই থাকবে।" বলে তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে ইঙ্গিতে জানালেন ফোটোগ্রাফারকে ডাকতে।

ফোটোগ্রাফে তোলবার জন্য যখন দাঁড়ালাম তখন মাদাম ইংরিজিতে বল্লেন—"একটু কাছে সরে আসুন।" এই একটিমাত্র ইংরিজি বাক্যই তিনি সেদিন বলেছিলেন আমাদের সঙ্গে। অথচ ইংরিজি তাঁর অজানা ভাষা নয়—যেমন সুন্দর বলতে পারেন, তেমন পারেন লিখতে। চীনের সকল জন-নায়ক এবং জন-নেত্রী বিদেশীদের সঙ্গে স্বদেশী ভাষাতেই কথা বলেন, বিদেশী ভাষায় যিনি যত দক্ষই হোন। অসংখ্য শিক্ষিত পুরুষ ও নারী চীনে আছেন যাঁরা নানা বিদেশী ভাষায় খুব ভালো বলতে পারেন, ভালো লিখতে পারেন। বিদেশীদের পক্ষে তাঁদের পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত চীনা কাগজগুলি এবং অনূদিত বইগুলি পড়বার সুযোগ ঘটে। পিপলস্ চায়না, চায়না রিকনষ্ট্রাক্টস, চাইনিজ লিটারেচার প্রভৃতি কাগজগুলি যাঁরা পড়েন অথবা যাঁরা কুয়ো মো-জোর নাটকের ইংরিজি তর্জমা, লুসুনের গল্পের তর্জমা কি চু ইউয়ানের কবিতার তর্জমা পড়েছেন, তাঁরাই তা বুঝতে পারেন। রাশিয়ান, জার্মান, ফরাসী,

ইংরিজি সব ভালো-ভালো দানই চীনা-ভাষায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে ; সেক্সপীয়ারের সব নাটকগুলিও। রবীন্দ্রনাথেরও কিছু কিছু তর্জমা আছে। তিনজিনে, নানকিংয়ে রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে 'ট্যাগোর-সাহিত্য' নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। যে ল্যাঙ্গোয়েজ-গ্রাজুয়েটরা ছয় সপ্তাহকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, সেই সতেরো-আঠারো থেকে উনিশ-কুড়ি বছর বয়েসের ছেলে-মেয়েরা ইংরিজি বলেন ও লেখেন সুন্দর অথচ মাত্র তিন বছর তাঁরা ভাষা শিক্ষা করেন।

সুঙ চিঙ-লিং আমাদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বল্লেন না বলে তাঁকে বুঝতে আমাদের এতটুকু কষ্ট হলো না। সে কেবল তাঁর দো-ভাষীর দক্ষতার জন্যই নয়, তাঁর অনুপম প্রকাশ-ভঙ্গির জন্যও। তাঁর প্রদীপ্ত মন, তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁর প্রগাঢ় মানব-প্রীতি এবং নব-সৃষ্টির প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ভাষার-বাঁধ উপচে আমাদেরকে আপ্লুত করে ফেলেছিল। অন্তত আমি তো নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

ফোটোগ্রাফ তোলা হলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম। গাড়ি যখন হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো, তখনো আমি ভাবচি মহিয়সী সুঙ চিঙ-লিংয়ের মাঝে শুধু নয়া-চীনের নারী-নেত্রীকেই দেখে এলামনা—আমাদের যৌবনকালের পরম শ্রদ্ধার পাত্র সান ইয়েত-সেনের বিশ্বমানবতারও স্পর্শ নিয়ে এলাম। এ-দিনটিও আমার কাছে চির-স্মরণীয় পুণ্য দিবস।

আরো একদিন

"আমাদের জন-জীবন দিনে দিনে সুন্দরতর হচ্ছে, বর্ণবহুল হচ্ছে এবং সাদৃশ্যে পরিপূর্ণ হচ্ছে। এ সবই শিল্পের বিকাশের সহায়ক, মাটি যেমন গাছের পরিণতির সহায়ক। আর আমাদের গবর্নমেণ্ট নাট্য-শিল্পকে যে সাহায্য দিচ্ছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তা যেন গাছের পরিপুষ্টি আর পরিণতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সূর্যের আলো, বর্ষার জল।"

—লিখেছেন চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা মি ল্যান-ফ্যাঙ।

তাঁকে দেখবার আগেই তাঁর লেখাটা পড়েছিলাম। তাঁর সম্বন্ধে শুনেছিলামও অনেক কথা। তাই তাঁকে দেখবার আগ্রহ খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেখবার সুযোগ হল সাংহাইতে। খবর পেলাম সমগ্র ডেলিগেশনটিকেই তিনি স্বাগত জানাতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সবাই পুলকিত হয়ে উঠলাম। চল্লিশ বছর কাল চীনের এই অনুপম এবং অদ্বিতীয় অভিনেতা কেবল চীনেরই নয়, ইউরোপ ও আমেরিকার নাট্য-রসিকদেরকেও অভিনয় দেখিয়ে মুগ্ধ করেছেন—তাও আবার পুরুষ চরিত্র অভিনয় করে নয়, নারী চরিত্র অভিনয় করে! শুনে ব্যক্তিটিকে দেখতে কার না কৌতূহল হয়?

যে-বাড়ীতে তিনি আমাদের দেখা দেবেন, নির্দিষ্ট দিনে সকাল দশটায় আমরা প্রায় এক কুড়ি নর-নারী সেই বাড়ীতে গিয়ে হাজির

হলাম। দেখলাম কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে তিনি একটি সুসজ্জিত হল-ঘরে আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সকলের সঙ্গে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। বয়েস তাঁর ষাট বছর। কিন্তু মুখে কোন রেখা পড়েনি, অধরে মোহন হাসি, চোখে প্রদীপ্ত দৃষ্টি। এখনো যখন অভিনয় করেন, স্ত্রী চরিত্রই অভিনয় করেন—চল্লিশ বছর যা করে এসেছেন। সমাজের এমন কোনরূপ নারী-চরিত্র নেই, যা তিনি অভিনয় দিয়ে ফুটিয়ে তোলেননি। রাজ-অন্তঃপুরিকা থেকে কুটীরবাসিনী—যুগ যুগান্তরের চীন-রমণীর চরিত্র অভিনয় দিয়ে তিনি প্রাণবন্ত করেছেন। বিদেশে প্রধানত তাঁরই অভিনয় প্রমাণ করে দিয়েছে অভিনয়-শিল্পে চীন পেছনে পড়ে নেই। যে-সব নবীন-নবীনা অভিনেতৃবর্গ আজ চীনে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, তাঁদের মাঝে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁর ছাত্র-ছাত্রী। সকলেই তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেন, তাঁর চরণতলে বসবার সুযোগ পেলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন।

শুধু যে অভিনেতৃগণই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন তা নয়, বিদগ্ধজনও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ; তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বলেই রাষ্ট্র তাঁকে সসম্মানে পোলিটিকাল কনসাল্‌টেটিভ কমিটিতে স্থান দিয়েছেন। অবশ্য কেবল তাঁকেই নয়, প্রতিভার অধিকারী আরো তিনজন অভিনয়-শিল্পীকেও সেই সম্মান দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানীয় গবর্নমেণ্টেও বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্য দেশের দুর্দিনে যে-ভাবে জন-সেবা করেছে, সেই কথা স্মরণ করে এবং এই আর্ট-ফর্মগুলি জন-সংযোগের যে ক্ষমতা রাখে তাই উপলব্ধি করে বর্তমান চীন গবর্নমেণ্ট এগুলিকে লালন করছেন, পালন করছেন, পরিণতিতে পৌঁছুবার সুযোগ করে দিচ্ছেন—যে

সহায়তাকে মি ল্যান-ফ্যাঙ সূর্যের আলো আর বৃষ্টির ধারার মতো প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করেছেন।

মি ল্যান-ফ্যাঙের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তোলবার আয়োজন করতেই সাংহাই সাহিত্য ও সংস্কৃতি সঙ্ঘের তরুণ সম্পাদক প্রস্তাব করলেন যে, তার আগে ওই দিগ্বিজয়ী অভিনেতা-নায়কের জীবন বৃত্তান্ত তিনি আমাদের শোনাতে চান। আমরা সানন্দে তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলাম।

তরুণ সম্পাদক বল্লেন—"পৃথিবীর বহুলোক জানেন মি ল্যান-ফ্যাঙ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। কিন্তু তাঁদের খুব অল্প লোকই জানেন যে, মি ল্যান-ফ্যাঙ চীনের দেশ-প্রেমিকদের মাঝেও একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"

পাঁচ সপ্তাহ চীনের সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে কাটিয়ে আমরাও সে-কথা শোনবার সুযোগ পাইনি। তাই আমরা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের সম্পাদকের বিবরণ শোনবার জন্য কৌতূহলে কণ্টকিত হয়ে উঠলাম।

তিনি বলে চল্লেন—"জাপানীরা যখন দেশ দখল করেছিল, তখন সমগ্র জাতির বিক্ষোভ দূর করবার অভিপ্রায়ে তারা দেশে একটা কৃত্রিম আনন্দের বান বহিয়ে দেবার চেষ্টায় নিযুক্ত হয়। মি ল্যান-ফ্যাঙকে তারা অনুরোধ করে দলবল জুটিয়ে তিনি নাট্যশালার দ্বার উন্মুক্ত করুন এবং নিয়মিত নাট্য-রস পরিবেশন করতে থাকুন।

মি ল্যান-ফ্যাঙ তাতে রাজি হতে পারলেন না। দেশের লোক অত্যাচারে উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, দেশের আকাশ-বাতাস উৎপীড়িত জনগণের মর্ম-পীড়ায় ভারি হয়ে উঠেছে, বহন করছে দিকে দিকে সেই বিক্ষুব্ধ বেদনা, দিকে দিকে উঠেছে তারই প্রতিধ্বনি। পীড়াপ্রদ হলেও তখনকার মতো তাই-ই হয়ে উঠেছিল কামনার

বিষয়। কেননা ওই বেদনাই জন্ম দেবে বিদ্রোহের প্রবৃত্তিকে, আর তারই ফলে আসবে লিবারেশন, বন্ধন থেকে সমগ্র জাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তি। জাপানী বিজেতাদের স্বার্থের খাতিরে, জাপানী শাসকদের নির্দেশে, দেশের কোথাও যে আনন্দ নেই, কেমন করে তা তিনি মঞ্চ থেকে পরিবেশন করবেন? আর কেনই বা কৃত্রিম আনন্দ পরিবেশন করে জাতির জনগণকে মিথ্যার মোহে আচ্ছন্ন করে তাদের অন্তরের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ-প্রবৃত্তির প্রকাশকে চাপা দিতে চাইবেন? সে কাজ তো দেশদ্রোহিতারই সামিল।

দেশকে ভালোবাসেন, দেশের নর-নারীকে ভালোবাসেন বলেই তো তিনি অভিনয় দ্বারা তাঁর দেশের সংস্কৃতিকে, তাঁর দেশের মানুষকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তারই জন্যই তো দেশে তিনি পেয়েছেন প্রগাঢ় প্রীতি, বিদেশে পেয়েছেন প্রচুর খ্যাতি। অভিনয়ের সাহায্যে যদি-না তিনি তাঁর দেশের মহিমময় মূর্তিটিকে রূপায়িত করতে পারতেন, তাহলে কোথায় থাকত তাঁর খ্যাতি, কোথায় থাকত তাঁর প্রতিষ্ঠা? জাপানী নির্দেশ তাঁর মনে এই প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করল। তিনি বল্লেন—পরবশ অবস্থায় তিনি অভিনয় করবেন না।

বিজয়ীর মুখের ওপর বিজিত জাতির যে-লোক এমন কথা বলতে পারেন, তিনি 'ন্যাশনাল হিরো', জাতীয় বীরপুরুষ রূপে সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এই বীরত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি কিন্তু শক্তির দম্ভে স্ফীত বিদেশী শাসকদের বিরাগভাজন হলেন।"

সাংহাই সাহিত্য ও সঙ্গীত সঙ্ঘের সম্পাদক বলে যেতে লাগলেন—"মি ল্যান-ফ্যাঙ কিছুতেই যখন অভিনয় করতে রাজি হলেন না, তখন জাপ-শাসকরা তাঁর টাকা-কড়ি বাড়ি-ঘর বাজেয়াপ্ত করল।"

মি ল্যান-ফ্যাঙের পাশেই আমি বসেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনাকে জেলে পুরে ফেল্ল না কেন?"

তিনি হেসে বল্লেন—"তারা জানত আমি নারী চরিত্র অভিনয় করি। হয়ত তাই ভেবেছিল আমার মাঝে পৌরুষ কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই।"

সম্পাদক শুনিয়ে যেতে লাগলেন—"গৃহহারা অর্থহারা এই শিল্পী অভাবের তাড়নায়, আশ্রয়স্থল ফিরে পাবার আশায়, বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন—এই ছিল জাপানীদের ধারণা। কিন্তু সমস্ত জীবন যিনি কোমলা নারী প্রকৃতিকে রূপায়িত করে এসেছেন, জাপ-শাসকরা দেখতে পেল আসলে তিনি বজ্রের মতোই কঠোর। এত বড় জনপ্রিয় শিল্পীকে আর বেশি পীড়ন করতে তাঁদের সাহস হল না। এতদিন মি ল্যান-ফ্যাঙ কেবল নাট্যশিল্পী হিসাবেই বিদগ্ধদের অভিনন্দন পেয়ে এসেছিলেন, এইবার জাপ-শাসকদের শক্তির দম্ভ অগ্রাহ্য করে ন্যাশনাল হিরো রূপে সমগ্র জনগণের বন্দনা পেলেন। মি ল্যান-ফ্যাঙ তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন—জাপ-বিজিত চীনে একরাত্রির জন্যও তিনি অভিনয় করেননি।"

আবেগে সম্পাদকের কণ্ঠ রুদ্ধ হল। মি ল্যান-ফ্যাঙের মুখমণ্ডল কর্তব্যপালনের গৌরবে উদ্ভাসিত, কিন্তু তিনি আমাদের কারু দিকে চেয়ে না দেখে মেজেতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চুপ করে বসে রইলেন। আমি করজোড়ে তাঁকে প্রণতি জানালাম। তিনি তাও লক্ষ্য করলেন না। অপর কোন সময়ে যদি আমি তা করতাম, তাহলে অন্তত দশবার তিনি প্রত্যভিবাদন জানাতেন। বুঝলাম তাঁর মন তখন ডুবে রয়েছে পরবশতার দুঃসহ জীবনের স্মৃতির মাঝে।

সম্পাদক মশাই বল্লেন—"ওর সম্বন্ধে সব কথা বলবার মতো সঞ্চয় আমার নেই। সংক্ষেপেই ওঁর পরিচয় আমি দিলাম। ওঁর একজন কৃতী শিষ্য ওঁর জীবনী লিখছেন, তাই থেকেই ওঁর অবদান আপনারা

জানতে পারবেন। আর ওঁর জীবন ও সাধনা নিয়ে একখানি ডকুমেণ্টারি ফিল্ম তোলবারও আয়োজন চলছে। নয়া-চীন ওঁর কাছে যে কত ঋণী, তা কেবল নয়া-চীনের লোকেরাই জানে।”

সম্পাদক মশাই আসন গ্রহণ করলেন। মি ল্যান-ফ্যাঙ এতক্ষণে মুখ তুলে আমাদের দিকে চাইলেন। আমি বল্লাম—“আপনার অভিজ্ঞতার কথা কিছু শুনতে চাই।” একটু কাল চুপ করে থেকে তিনি বল্লেন—“নট-জীবন যখন শুরু হয়, তখনকার অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত। তখনকার দিনে নট-নটীদের যে অত্যাচার এবং লাঞ্ছনা সহ্য করতে হোতো, তার বিবরণ অল্প কথায় দেওয়া যায় না। তাদের মনুষ্যত্বের অবমাননা যেভাবে করা হত, আজও তা স্মরণ করে গ্লানি অনুভব করি। ধনীরা আমাদের পরিবেশন করা আনন্দ উপভোগ করত, কিন্তু আমাদেরকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করত না। থিয়েটারের দালালরাই ছিল আমাদের ভাগ্য-বিধাতা। শিক্ষানবীশদের ওপর যে অবিচার তারা করত, তা যখন স্মরণ করি, তখন শুই ভেবে বিস্মিত হই যে, দেশে এত দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী কি করে প্রতিষ্ঠা লাভ করল।”

—“কেমন করে করল?” আমি জানতে চাইলাম।

—“চীনের জনগণ থিয়েটারকে চিরদিন ভালোবাসত বলে। যার পিছনে জন-সমর্থন থাকে, তা লোপ পেতে পারে না। ফিউডাল লর্ডরা, থিয়েটারের দালালরা, অভিনেতৃদের ওপর কত উপদ্রবই না করেছে; তাদের মান-সম্ভ্রমের কোন মর্যাদাই দেয়নি। শুধু জন-সম্বর্ধনা পেত বলেই অভিনেতৃরা থিয়েটার ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। সকলের সকল অবিচার, সকল ব্যভিচার অগ্রাহ্য করেও তারা নাট্য-শিল্পের সাধনা করেছে। আজ জমিদার নেই, দালাল নেই—কিন্তু থিয়েটার আছে। আর নানা দুঃখ কষ্ট অবিচার অত্যাচার সহ্য করেও নট-নটীরা থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বলেই, অভিনয়ের আর্টকে

অম্লান রাখতে পেরেছিল বলেই, আজ তারা মান পেয়েছে, মর্যাদা পেয়েছে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তারা আজ জন-সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়নি বলেই না পিপ্‌লস্ গবর্নমেণ্ট তাদের সহায়তায় অগ্রসর হয়েছে—দাক্ষিণ্য নিয়ে নয়, শ্রদ্ধা নিয়ে। দালাল পরিচালিত থিয়েটার আজ আর চীনে নেই। আজকার চীনের থিয়েটার হচ্ছে কো-অপারেটিভ থিয়েটার।"

দালালের থিয়েটার মানে হচ্ছে সেই থিয়েটার, যে থিয়েটারে অর্থের আমদানিই হচ্ছে বড় কথা, শিল্প সৃষ্টির, জাতির প্রগতির কথা যেখানে বড় কথা করে তোলা হয় না। বলা বাহুল্য সে-রকম থিয়েটার থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"নয়া-চীনে অভিনয় শিক্ষার কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে?"

জবাবে তিনি বল্লেন—"আজকার ছাত্র-ছাত্রীদের কেবল নাট্য-কলাই শিক্ষা দেওয়া হয় না, সাধারণ শিক্ষাও দেওয়া হয়,—যাতে করে কেবল অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবেই নয়, সার্থক নাগরিক রূপেও তারা প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে আজ পিকিংয়ের ক্ল্যাসিকাল নাট্য-নিরীক্ষা নিকেতনে (এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল স্কুল অব ক্ল্যাসিকাল ড্রামা) অভিনয় ও নাট্যকলা অনুশীলন করে। তার জন্য তাদেরকে অর্থব্যয় করতে হয়না।"

—"শুধু কি ক্লাসিকাল নাটক সম্বন্ধেই এই সুব্যবস্থা করা হয়েছে?" জানতে চাইলাম আমি।

—"না, না, সকল রকম নাট্য শিল্পই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে।" তাড়াতাড়ি বলেই তিনি একটু হাসলেন। তারপর যেন নিজের ত্রুটি সংশোধন করবার জন্য বল্লেন—"আমি নিজে ক্লাসিকাল নাটক অভিনয় করি বলেই হয়ত ওর ওপর অযথা জোর দিয়েছি। যেমন পিকিংয়ে

তেমন সকল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রেও সর্বপ্রকার নাট্যকলা শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। জাতি-সংগঠনের কাজ যত অগ্রসর হবে এদের প্রসারও তত বৃদ্ধি পাবে।”

আমি বল্লাম—“পিকিংয়ে নাট্য-গবেষণা সমিতির (ড্রামাটিক রিসার্চ সোসাইটি) ডিরেকটারের সঙ্গে, তাঁর বাড়ীতে গিয়ে, আমরা দেখা করেছিলাম। তাঁর অভিনয়ও আমরা দেখেছিলাম। খুবই শক্তিমান অভিনেতা তিনি।”

—“এই রিসার্চ খুবই প্রয়োজনীয় হয়েছে ক্লাসিকাল নাটক সম্বন্ধে। আমাদের ক্লাসিকাল নাট্য-ভাণ্ডারে অনেক ভালো-ভালো নাটক আছে। কিন্তু তার সবগুলি আজকার জাতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। কতকগুলি সামন্ততন্ত্রের সমর্থন করেছে, কতকগুলি ইতিহাসকে মর্যাদা দেয়নি, কতকগুলি রোমাঞ্চ সৃষ্টির দিকে ঝোঁক দিয়েছে বেশি। সেগুলিকে একটু-আধটু পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করে নিলে কালোপযোগী ভালো নাটক, সর্বকালের নাটক, করে গড়ে তোলা যেতে পারে। ড্রামাটিক রিসার্চ সোসাইটির কাজ হচ্ছে তাই।”

আমাদের নিজেদের নাটকের কথা মনে পড়ে গেল। আমি বল্লাম—“পরবশতার দিনে নাটককে আমরা মুক্তির বাণী প্রচারের মাধ্যম করে নিয়েছিলাম। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক বিষয়গুলিকে তখনকার দিনের জাতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করবার দিকে লক্ষ্য রেখে পুরাণ এবং ইতিহাসকে অতিক্রম করে, লঙ্ঘন করেও, আমরা নাটক রচনা করতাম। আমি নিজেও তাই করেছি। যখন কংগ্রেস কারারুদ্ধ, প্রেস শৃঙ্খলিত, সেই সময়ে নাট্যশালাকে অবলম্বন করে আমাদের নাট্যকাররা কাজ করেছেন। এবং যেহেতু পুলিশ কমিশনারের পারমিট ছাড়া থিয়েটারের মালিকরা কোন নাটক অভিনয় করা

নিরাপদ মনে করতেন না (এখনও করেন না) সেই হেতু ইতিহাস পুরাণকে অবলম্বন করে যে-সব নাটক রচনা করা হত, তাতে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তত্ত্বের ও তথ্যের ওপর ততটা জোর দেওয়া হতনা, যতটা জোর দেওয়া হত তখনকার দিনের প্রয়োজনের ওপর।”

—“আমাদের অতীত দিনের নাট্যকাররাও তাই করতেন। সামন্ততন্ত্রের যুগে রচিত এমন সব নাটক রয়েছে, যা স্থকৌশলে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার করেছে ইতিহাসকে অবজ্ঞা করেও। ঐতিহাসিক সে-সব নাটকের মূল্য দেবেন না, কিন্তু দেশ-প্রেমিক তাদের মূল্য দেবেন ; মানব-হিতৈষী তাদের মূল্য দেবেন।”

আমি বল্লাম—“সে নাটকগুলি ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করেও ঐতিহাসিক প্রয়াস হয়ে রয়েছে। জাতির মুক্তির ইতিহাসে তাদের একটা বিশেষ স্থান এবং দান অস্বীকার করবার উপায় নেই।”

—“ঠিক তাই।” তিনি বল্লেন। “আমাদের ড্রামাটিক রিসার্চ সোসাইটি,” তিনি আবার শুরু করলেন, “এই মূল্য নিরূপণের কাজে নিযুক্ত আছেন। কোথায় কোন্ ত্রুটি সংশোধনের অবসর রয়েছে মানবতার কষ্টি-পাথর দিয়ে তাই তাঁরা বিচার করছেন। মানুষকে উন্নত করবার প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় যে নাটকে, সেই নাটকই তাঁরা ত্রুটি বিবর্জিত করে পরিবেশন করতে চান। মানুষকে যা অবনত করতে পারে, প্রগতিবিরোধী করতে পারে, প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলতে পারে, অর্থাৎ সোশ্যালিজম সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে, সে-নাটক জাতীয় নাট্য-রিপার্টোরিতে যাতে না স্থান পায়, ড্রামাটিক রিসার্চ সোসাইটি তাই দেখেন। অবশ্য চীনের জন-মনেও এমন চেতনা এসেছে যার ফলে ওই শেষোক্ত নাটকগুলি অভিনীত হলেও আর অভিনন্দিত হয় না।”

—"দর্শকদের এই মনের পরিবর্তন আমাদের দেশেও ঘটেছে, আমি লক্ষ্য করেছি। আমারই কোন কোন জনপ্রিয় নাটকের যে-সব সংলাপ দর্শকদের মনে এতদিন উত্তেজনার সঞ্চার করত, প্রচণ্ড করতালি ধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত হোতো, আজ সেই সব সংলাপ তেমন সাড়া জাগায় না। দর্শকমন হয় এগিয়ে গেছে, নয় পিছিয়ে পড়েছে।"

—"দুইই হতে পারে। জাতির গতি বুঝতে না পারলে সঠিক কারণ নির্ণয় সম্ভব নয়। আমাদের দেশে আজকার দর্শকদের বেশির ভাগই হচ্ছে কৃষক শ্রমিক সৈনিক আর সমাজকর্মী। জীবন সম্বন্ধে তাদের এসেছে নতুন চেতনা, অনুভূতিও তাদের নতুন। আমিও লক্ষ্য করেছি আগেকার দর্শকেরা যে কথা শুনে আনন্দে হেসে উঠত, এখনকার দর্শকরাও হয়ত সেই কথা শুনে হেসেই ওঠে, কিন্তু হাসি আনন্দের হাসি নয়, উপহাসের হাসি। নারী-চরিত্র নিয়ে কোনরূপ রসিকতা করলে আগেকার দর্শকরা তা খুবই উপভোগ করত, কিন্তু আজকার দর্শকেরা তা আদৌ সহ্য করতে পারেনা। অভিনয়ে অতিরঞ্জন ছিল আগেকার দর্শকদের বিচারে আসল অভিনয়। কিন্তু আজকার দর্শকরা অতিরঞ্জিত অভিনয় দেখলে বিরক্ত হয়।"

"অভিনয় পদ্ধতিরও তাহলে পরিবর্তন হচ্ছে বলুন।" আমি মন্তব্য করলাম।

—"পরিবর্তন হচ্ছে বৈকি! শিক্ষায়ই তো বড় পরিবর্তন হয়েছে। আমরা যখন অভিনয় শুরু করি, তখন আমরা যে শিক্ষা নিয়ে থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলাম, এখনকার অভিনেতৃরা তার চেয়ে পৃথক শিক্ষা পায়। রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে তারা প্রচুর জ্ঞান নিয়েই থিয়েটারে আসে। তা-ছাড়া আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা থাকে, নাট্যকারদের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলা হয় বেশি। আজকার দর্শকরা যতটা উন্নত হচ্ছে, অভিনয়-পদ্ধতিরও ততই উন্নতি হচ্ছে।

পরিবর্তনও হচ্ছে। শুধু অভিনয় পদ্ধতিরই নয়, অভিনেতৃদের মনেরও।”

—“যথা ?” আমি জানতে চাইলাম।

“আমার কথাই ধরুন,” তিনি বলতে লাগলেন, “আমি যে-সব নাটক অভিনয় করে দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছি, তার মাঝে এমন নাটকও আছে যা মানুষের উন্নতির পরিপন্থী। যখন সেই সব নাটক অভিনয় করে খ্যাতি কুড়োতাম, তখন সে-নাটকগুলির দোষ ধরতে পারিনি। কিন্তু আজ পেরেছি। তাই আজ কোন কিছুর লোভেই সেগুলি অভিনয় করতে রাজি নই। শুধু আমিই যে আমার দীর্ঘকালের প্রিয় নাটকগুলি প্রগতি-বিরোধী বলে বর্জন করেছি তা নয়, চৌ সিন-ফ্যাঙ, সাও চাঙ প্রমুখ প্রবীণ এবং প্রাজ্ঞ অভিনেতারাও ওই একই কারণে তাঁদের খ্যাতির সহায়ক, তাঁদের চিত্তপ্রিয় কয়েকখানি নাটক আর অভিনয় করেন না।”

মানুষের অকল্যাণ হতে পারে যে-নাটকে, তার অগ্রগতির প্রয়াসকে যে-নাটক শ্লথ করে দিতে পারে, সে-নাটক অভিনয় করা সত্যই কেবল শিল্পীর বিচারেই অসঙ্গত নয়, সমাজবিরোধী কাজও বটে। নয়া-চীনের অভিনেতৃরা তাই মনে করে তাঁদের ক্লাসিকাল নাটকগুলিকে যেমন ঝালিয়ে নিচ্ছেন, তেমন সংশোধনের অযোগ্য নাটকগুলিকে বর্জনও করছেন। নাটকের টেকনিকই তাঁদের কাছে আর বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে বিষয়বস্তু, আর বড় কথা নাটকের শিল্প-সম্ভার। ক্লাসিকাল নাটকের টেক্‌নিক আর আধুনিক নাটকের টেক্‌নিক এক নয়। কিন্তু যে-হেতু ক্লাসিকাল নাটক সার্থক শিল্প-সৃষ্টি এবং আজও জনগণমনোহর, সেই হেতু আধুনিকতার প্রবল দাবি সত্ত্বেও ক্লাসিক নাটকের টেক্‌নিক অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, কোনরূপ আধুনিকতাকে তার ওপর হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হয়নি। আবার ক্লাসিকাল নাটকের গুরুস্থানীয় অভিনেতৃরাও আধুনিক নাট্য-প্রয়াসের

অভিভাবকত্ব করতে অগ্রসর হচ্ছেন, কিন্তু কদাচ ক্লাসিকাল চাল তার ওপর আরোপ করবার কল্পনা নিয়ে কাজ করছেন না। এ ব্যাপারেও মাও সে-তুঙের অমূল্য উপদেশ তাঁরা উপেক্ষা করেন না—সকল ফুল নিজ-নিজ রূপ ধরে ফুটে উঠুক।

দুই ঘণ্টাকাল আমরা মি ল্যান-ফ্যাঙের সঙ্গ পেলাম। আর বেশি উপদ্রব করা অসঙ্গত হবে ভেবে আমি বিদায়ের কথা তুল্লাম। আমাদের ডেলিগেশনের সদস্যরা প্রস্তাব করলেন যে, মি ল্যান-ফ্যাঙ আর তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে একটি গ্রুপ ফটো তোলা হোক। মি ল্যান- ফ্যাঙ সানন্দে সম্মতি দিলেন। চায়না পীস কমিটির ফোটোগ্রাফাররা সর্বত্রই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। ফটো তাঁরা তুলে নিলেন। বেলা সাড়ে বারোটায় আমরা বর্তমান চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং তাঁর তরুণ-তরুণী শিষ্য-শিষ্যাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

সেদিন বিদায় নিয়ে এসেছি সত্য, কিন্তু মনের পটে আজও মি ল্যান-ফ্যাঙের সৌম্য সুহাস ও কল্যাণময় মূর্তি ভাস্বর রয়েছে।

সাংস্কৃতিক প্রয়াস

চীনের সংস্কৃতি অতি প্রাচীন। সন তারিখের সন্ধান রাখি না, তবে পুঁথিতে পাই তিন হাজার বছর ধরে তা গড়ে উঠেছে। কাব্য নাটক শিল্প সদাচার প্রাচীন চীনকে কী রূপ দিয়েছিল আজ বিদেশ থেকে চীনে গিয়ে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু চীনের ওপর দিয়ে কম ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে যায় নি। প্রাচীন সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয় যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে সংরক্ষিত কয়েকটি স্থাপত্যে এবং মিউজিয়ামে রক্ষিত কিছু কিছু চিত্রে এবং শিল্পসামগ্রীতে। কিন্তু চীন সভ্যতার পত্তনি-কালের তুলনায় তাকে আধুনিকই বলা চলে যেহেতু সেগুলি সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতাদের কীর্তি। অবশ্য এই সাম্রাজ্য গঠনের ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছরেও পাওয়া যায় Hisa Sung Dynasty-র উল্লেখ থেকে। চীনের ইতিহাস তারপর থেকে এই রকম সব সম্রাট বংশেরই ইতিহাস। বড় বড় দশ-বারোটা সম্রাট বংশের বিবরণ পাওয়া যায় যাদের শাসনকালে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি প্রভূত উন্নত হয়েছিল। স্থাপত্যের নিদর্শন এখন যা পাওয়া যায়, তা যদিও ষষ্ঠ শতকের আগেকার স্থাপত্য নয়, তবুও নানা শিল্পনিদর্শন তারও বহু পূর্বের দেখা গেছে। ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব দু' হাজার বছর আগেও, কাব্য সাহিত্যের পত্তনি পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকে, যা পূর্ণ বিকশিত হয় ছয়শত

সাতশত খ্রীষ্টাব্দের মাঝে। এই ইতিহাস সাহিত্য দর্শন কাব্য নাট্য এখন আছে কি-না তা আমি বলতে পারি না। এমন কোন প্রতিষ্ঠানে আমার যাবার সুযোগ হয়নি, যেখানে গেলে ও-সম্বন্ধে কিছু জানা যেতো। শুধু তিনজিন ন্যাশনাল মিউজিক কনজারভেটরিতে চীন-সঙ্গীতের এমন স্বরলিপির বই দেখতে পেয়েছি, যার রচনা কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫১ বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ওই রকম পুনর্মুদ্রিত অনেক স্বরলিপির বই এবং কিছু বাদ্যযন্ত্র ওই কনজারভেটারিতে সংরক্ষিত আছে। পিকিং মিউজিয়ামে এবং পিকিংয়ের টেম্পল অব হেভ্‌ন-এ নানা প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র আছে; অধিকাংশই তারের অথবা হাওয়ার সাহায্যে বাজানো হয়। প্রাচীনকালের নানা রকম ঘণ্টাও দেখতে পাওয়া যায়। তারের এবং হাওয়ার যন্ত্রগুলি কিছু কিছু এখনও ব্যবহৃত হয় দেখতে পেলাম। তিনজিনের এই কনজারভেটরিতে যে যন্ত্রগুলি দেখতে পেলাম, তাদের এই নাম: (১) Hsion মুখ বাঁশি (২) Sona পেতলের ক্লারিওনেট জাতীয় মুখ বাঁশি (৩) Lin খঞ্জরী, (৪) Pipa চার তারের যন্ত্র, (৫) Sang পঁচিশ তারের যন্ত্র, (৬) Sanhisan তিন তারের, (৭) Erhon দুই তারের, (৮) Pangtsi কাঠের যন্ত্র, (৯) Shen অনেকগুলি বাঁশের নল দিয়ে তৈরি হাওয়ার যন্ত্র। এ ছাড়া নানা আকারের এবং প্রকারের ঢাক। এর কোন কোন যন্ত্র এবং কিছু কিছু নানা বিষয়ক বই পিকিংয়ের সাহিত্যিক এবং শিল্পীসঙ্ঘ আমাদের প্রতিনিধিদলকে উপহার দিয়েছেন, তিনজিন কনজারভেটরিও তাই করেছেন। পিকিংয়ের মিউজিয়ামে, নানকিংয়ের মিউজিয়ামে খ্রীষ্টপূর্ব আমলের নানা তৈজসপত্র এবং ষোড়শ শতাব্দী থেকে আধুনিক কালের যে সব শিল্পনিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়, তা অনুপম—বিশেষ করে পিকিং মিউজিয়ামে এবং পিকিং সামার প্যালেসে পূর্বতন সম্রাট সম্রাজ্ঞীদের আমলের শিল্প-সামগ্রীগুলির তুলনা নেই। এখনো আমার

চোখের সামনে যার অপরূপ রূপ ভেসে বেড়াচ্ছে তার কয়েকটির উল্লেখ করি: হাতীর দাঁত থেকে তৈরি শীতলপাটি, ওই আইভরির আর জেডের নানা রকম ল্যাম্প-শেড, মণি-মুক্তা প্রবাল প্রভৃতির তৈরি পুষ্পগুচ্ছ, চীনা সিল্কের উপর নানা বর্ণের রেশমী সুতার এমব্রয়ডারি, যুগের যুগের চীনা মাটির তৈরি নানা বর্ণের চিত্রাঙ্কিত নানা আকারের ও প্রকারের পাত্র, নানারূপ শামদান, ঝাড়-লণ্ঠন ইত্যাদি।

কিন্তু শিল্প সাহিত্য দর্শন কাব্য কিছুই সংস্কৃতি নয়, সংস্কৃতির বাহক, প্রকাশক। চীনের বর্তমান সংস্কৃতি কি এবং অতীতেই বা তা কি ছিল? ওই সব নিদর্শন থেকে বোঝা যায় জীবনকে সুন্দর করে, বর্ণবহুল করে, ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে ফুটিয়ে তোলাই ছিল তার অতীত সংস্কৃতি। প্রশ্ন ওঠে, অতীতের সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের আমলে কি চীনের জনসাধারণের কখনো সুযোগ হয়েছিল জীবনকে ফুটিয়ে তোলবার? তেমন পরিচয় আমি পাইনি। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা চমৎকার কথা মনে পড়ছে। নানা যুগের নানা বিচিত্র শিল্প নিদর্শন দেখতে দেখতে আমি আমার দোভাষী মেয়েটিকে বললাম—"তোমরা তো বল সম্রাট সম্রাজ্ঞীরা খুবই খারাপ লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁরা লোক খারাপ হলেও ভালো কাজও যে করতেন, এইগুলি তার নিদর্শন। দেখিয়ে তোমরা গৌরব অনুভব করছ।"

মেয়েটি সপ্রতিভ ভাবে প্রশ্ন করল—"ওর কোনটা কোন সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী নিজের হাতে তৈরি করেছে বলে কোথাও কি লেখা আছে?"

আমি বললাম—"না, তুমি বলনি তা লেখা আছে।"

"তারা কেউ কিছুই নিজেদের হাতে তৈরি করেনি।" দৃঢ়কণ্ঠে সে বলল।

আমি বললাম—"হয়ত তাই।"

"তৈরি যারা করেছিল, তারা এসেছিল জনসাধারণ থেকে।" সে বলতে লাগল—"এ সব তাদেরই জীবন-ব্যাপী সাধনার, পরম্পরাপ্রাপ্ত সাধনার নিদর্শন। এসব জনগণের সৃষ্টি। সম্রাট-সম্রাজ্ঞীরা এগুলি তাদেরই দিয়ে করিয়েছিল হয়ত পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক না দিয়েই। জনগণের এই সৃষ্টি তারা তাদের প্রাসাদে পুরে রেখেছিল কেবল স্বার্থপুরের মতো নিজেরাই এগুলি ভোগ করবে বলে। সে তো ছিলই, অতিরিক্ত ছিল জনগণ এগুলি দেখে যাতে না নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, সেই অভিসন্ধি। এ-সব প্রাসাদে জনগণের ঢোকবার অধিকার ছিল না। আমরা তাই সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের এই সব প্রাসাদকে আজ জনগণের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান করে দিয়েছি। হাজারে হাজারে এসে তারা দেখে যাচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষরা কী অপরূপ সৃষ্টিতে সক্ষম ছিল।"

খুব মন দিয়েই মেয়েটির কথা শুনছিলাম। হয়ত এ কথাগুলি সে ক্লাসে শিখেছে। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? সে শিখেছে, শেখা বিষয়কে সত্য বলে গ্রহণ করেছে এবং জীবনকে সেইভাবে গড়তে চাইছে। এইটে হোলো সংস্কৃতি। জাতির অতীতকে জেনে বর্তমানকে এমন ভাবে গঠন করতে চাইছে যাতে ভবিষ্যতে সে কাম্য ফল পেতে পারে। নয়া চীনের কাম্য ফল হচ্ছে পূর্ণ সোশ্যালিজম। লব্ধকাম হতে হলে মাও সে-তুঙ যা বলেছেন তাই করতে হবে—অর্থাৎ, কাজ করে (কেবল বক্তৃতা দিয়ে অথবা লিখে নয়) সকল ফুলকে ফুটিয়ে তুলতে হবে ; আর পুরাতনকে অবহেলা না করে নবযুগোপযোগী করে গড়তে হবে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, শিল্প সবই মানুষের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক করে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া, নর-নারীকে তার জন্য তৈরি করা যার মাধ্যমে সম্ভব, তাই হচ্ছে সংস্কৃতি।

পিকিং মিউজিয়ামে কনফুসিয়াসের প্রতিকৃতির নিচে বড় বড়

হরফে লিখে রাখা হয়েছে—কনফুসিয়াস সামন্ত প্রভুদের দরবারে ছিলেন, সামন্ততন্ত্র দ্বারা মানব-কল্যাণ সাধিত হতে পারে বিশ্বাস করতেন, সে কথা মনে করে তাঁর অমূল্য উপদেশ যেন অগ্রাহ্য না হয়। তাঁর দিনে সামন্ততন্ত্র ছিল মানুষের আত্মপ্রসারের মাধ্যম। আজ আমাদের দেশে আর তার অস্তিত্ব নেই কিন্তু কনফুসিয়াসের অমূল্য উপদেশ আজও সত্য রয়েছে। যা নেই তা মিথ্যে। সেই মিথ্যের কথা স্মরণ করে আমরা যেন না শাশ্বত সত্যকে অবজ্ঞা করি। অনেক বড় কথা। এই কথা হৃদয়ঙ্গম করা, এই ভাবে মন গড়ে তোলা হচ্ছে সংস্কৃতি। নয়া চীন তাই করতে চাইছে। তাই হচ্ছে চীনের নব সংস্কৃতি।

কনফুসিয়াসের মানব-জীবন-দর্শন উপদেশের আকারে প্রচারিত, কিন্তু কোন ধর্মের নির্দেশ নয়। আসলে তা হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার। মানুষের কল্যাণ, মানুষের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে তার কথা। নয়া চীন সামন্ততন্ত্র বর্জন করেছে কিন্তু কনফুসিয়াস সামন্ততন্ত্রের প্রতি আস্থাবান ছিলেন বলে কনফুসিয়াসকে বর্জন না করে তাঁর উপদেশ মতো ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছে। রাষ্ট্রকে যেমন সে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত রাখতে চাইছে রাষ্ট্রকে মানুষের চেয়ে বড় করে না তুলে, তেমন শিক্ষাকেও নিছক বিদ্যার বোঝা না করে মানুষের প্রয়োজনানুরূপ করে গড়তে চাইছে। এই যে পার্থক্য সে করেছে, এই হচ্ছে নব সংস্কৃতির পরিচায়ক। দেশের মুক্তির পুর্বে তার শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যষ্টিকে ফুটিয়ে তোলা। আজ তার লক্ষ্য সমষ্টিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। লিবারেশনের আগে তার শিক্ষায় বহুলোক সুপণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু সেই বহু সুপণ্ডিত দুর্গত জাতির দুর্গতির মোচন করতে পারেননি। অথচ শিক্ষা তাঁদেরকে শক্তি দিয়েছিল। শিক্ষা শক্তি যোগায় বলেই নয়াচীন

চাইছে সমষ্টিকে শিক্ষার দ্বারা শক্তিমান করে তুলতে। তা করতে হলে শিক্ষাকে প্রথমত করতে হবে ব্যয়নিরপেক্ষ, দ্বিতীয়ত তাকে বাহুল্য-বিবর্জিত সরল করতে হবে, তৃতীয়ত শিক্ষার বোঝা যাতে করে শিক্ষার্থীকে কুব্জদেহ ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ না করে ফেলে তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, চতুর্থত শিক্ষার খাতে সরকারের ব্যয় যাতে না অপব্যয় হয়, তারও ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে—অর্থাৎ, শিক্ষান্তে শিক্ষিতেরা যাতে বেকার বসে না থেকে সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে সরকারকেই তারও সুযোগ করে দিতে হবে এবং শিক্ষিতেরা যাতে না ভাবপ্রবণতায় আকাশ-কুসুম চয়ন করবার জন্য ঊর্ধ্বমুখ ও উন্নতনাসা হয়ে বৃহত্তর জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তার জন্য তাদেরকে শিক্ষাকালে যেমন পল্লীতে ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে, তেমন শিক্ষাবসানেও তাদেরকে ওয়ার্কার্স হতে হবে; কাজ করে দেখাতে হবে যে তারা জনগণকে এবং জাতিকে অগ্রগামী হতে সহায়তা করছে। তাদের বিদ্যা সংস্কৃতি নয়, তাঁদের ওয়ার্কার হওয়াও সংস্কৃতি নয়, সংস্কৃতি হচ্ছে সেই মানসিক রূপান্তরের প্রয়াসকে তাদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া।

লিবারেশনের পূর্বে যেমন শিক্ষাকেই শিক্ষিতের লক্ষ্য করে রাখা হয়েছিল, তেমন সকল প্রকার আর্টের চরম কথা ধরে নেওয়া হয়েছিল আর্ট। লিবারেশনের পর স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে শিক্ষা যেমন শিক্ষাতেই শেষ না হয়ে সমাজ-কল্যাণের দায়িত্ব নিতে বাধ্য, তেমন সর্বপ্রকার আর্টকে আর্ট তো হতেই হবে, তদুপরি মানুষকে উন্নত করার দায়িত্বও তাকে নিতে হবে। শিক্ষার্থীর মতো আর্টিস্টকেও তাই মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রত্যক্ষভাবে নিতে হবে, কাব্যে উপন্যাসে নাটকে সঙ্গীতে তাই রূপায়িত করতে হবে। সে রূপায়ণ সার্থক হলো কি ব্যর্থ হলো তা

নির্ধারিত হবে জনগণ তা গ্রহণ করলো, কি করলো না, তাই দেখে— পণ্ডিতদের বা সমালোচকদের সার্টিফিকেটের চেয়ে মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে জনগণের অভিমত—যেহেতু আর্টকে জাতীয় হতে হবে, যেমন হবে শিক্ষাকে। আর্ট কতটা বাস্তব হবে, কতখানি কল্পনার পরিসর তাতে থাকবে, কতটা সিম্বলিক হবে, তা আর্টিস্টকে কেউ বলে দেবে না—জনবোধ্য করবার জন্য যা দরকার হবে, যতটুকু দরকার হবে, আর্টিস্টকে তাই বুঝে তার আর্টের রূপ দিতে হবে। জনগণকে শিক্ষিত করে তোলবার, রসোপভোগে দক্ষ করে তোলবার দায়িত্ব কেবল কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, নর্তক, নাট্যকার ও অভিনেতৃ-দের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা হবে না,—তার জন্য সকল বিদ্যালয়কে, সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে এবং সরকারকে সর্বদা অবহিত থাকতে হবে। হচ্ছেও তাই।

বিশ্ববিদ্যালয় দেখছে তার ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন শিক্ষা গ্রহণ করছে, তেমন জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে কি না। নৃত্য, গীত, অভিনয় সংস্কৃতির বাহন বলেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তা অভ্যাস করবার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত নাচগান অভিনয় আমরা দেখেছি, শুনেছি। এ-কথা মনে হয়নি যে তারা এমেচার। সুর তাল সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অবহিত। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যে দো-ভাষী ছেলে-মেয়েরা থাকত, তাদের প্রায় সকলকেই গাইতে শুনেছি এবং তারা আমাদের হিন্দী গান 'হিন্দী চীনী ভাই ভাই' অতি সহজেই তুলে নিয়েছে; পিকিং বিশ্ববিদ্যাবয়ের হিন্দী ছাত্ররাও তাই করেছে। তিনজিন জাতীয় সঙ্গীত কনজারভেটরি পাঁচ বছরের কোর্সে ছেলে-মেয়েদের আধুনিক ও প্রাচীন চীনা সঙ্গীত এবং বিদেশী সঙ্গীতও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তার জন্য বেতন দিতে হয় না, খাবার এবং থাকবার জন্যও কিছু নেওয়া হয় না। বর্তমানে কনজার-

ভেটরিতে ৩৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। তাদের অনেকেই এসেছে শ্রমিক ও কৃষক পরিবার থেকে। এই ন্যাশনাল কনজারভেটরিটির প্রসারের জন্য একে পিকিংয়ে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শিশুদের নার্সারিতেও সঙ্গীত-নৃত্য শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাংহাইতে একটি নার্সারির শিশু-শিল্পীরা আমাদের গান শুনিয়েছে, নাচ দেখিয়েছে। শিশুদের উপযুক্ত পোশাক ও প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র, এমন কি, পিকিং অপেরায় যে বিশেষ ধরনের দুষ্প্রাপ্য পোশাক ব্যবহৃত হয়, তাও নার্সারি তৈরি করিয়েছে। স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের কথা তো আগেই বলেছি। জেলখানায়, ফ্যাক্টরিতে, পল্লীতে পল্লীতে, বড় বড় কন্সট্রাকশন যে-সব জায়গায় হচ্ছে, সর্বত্র নৃত্যশালা রয়েছে, নাট্যশালা রয়েছে। সঙ্গীতের আসর, বসবার স্থান করে দেওয়া হয়েছে, বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছে। স্যানাটোরিয়াগুলিতেও আরোগ্যমুখীন রুগীদের সঙ্গীত-চর্চার সহায়ক ব্যবস্থা করা হয়েছে। কয়েদীদের, শ্রমিকদের, কৃষকদের কেউ কেউ সঙ্গীত রচনা করছে, কেউ কেউ সুর দিতে সিদ্ধ হয়ে উঠছে, কেউ কেউ কবিতা লিখছে, নাটকও রচনা করছে; অভিনয়ে নাচে গানে অনেকেই দক্ষ হয়ে উঠেছে। যে-সব শ্রেণী থেকে এরা এসেছে, চিরকালই সেই সব শ্রেণী থেকে লোক-সঙ্গীত, লোক-নৃত্য রচনা করবার, সুর-যোজনা করবার, অভিনয় করবার লোকের উদ্ভব হয়েছে, সকল দেশেই। কিন্তু শিক্ষিতেরা তাদেরকে অপাংক্তেয় রেখেছিল। নয়া চীনে শিক্ষিতদেরকে নিয়ে পৃথক শ্রেণী গড়ে রাখবার প্রয়াস আজ আর নেই। সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্য সংস্কৃতির এই প্রধান প্রধান ধারক ও বাহকগুলি কেবলমাত্র শিক্ষিতদের কালচারের বিষয় করে না রেখে পুরোপুরি ন্যাশনাল করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। অভিনেতা, অভিনেত্রী, চিত্রী, গায়ক, নর্তকদেরকেও জাতির জীবন-স্রোতে অবগাহন করে নিতে হবে। তার অর্থ, মঞ্চ, সঙ্গীত-

আসর এবং চিত্রশালা থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে গিয়ে পল্লীর আর ফ্যাক্টরির কর্মীদেরকে প্রত্যক্ষভাবে জেনে শিল্প-সৃষ্টি করতে হবে। যদি সেই সৃষ্টি জনমনে সাড়া তুলতে পারে, তাহলে সেই সৃষ্টিই জাতীয় শিল্প-সৃষ্টিরূপে অভিনন্দন পাবে, নইলে নয়। অবশ্য ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রকাশ উপেক্ষিত হবে না, কিন্তু তাকে জাতীয় শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হবে না। এরূপ অবস্থায় শিল্পীরা গণ-সংযোগ করতে চাইবেই। ফলে তাদের সৃষ্টি শ্রেণী-বিশেষের সৃষ্টি হয়ে দুর্বল ও গতানুগতিক হয়ে পড়বে না—নিয়তই জীবন-রসের যোগান পাবে।

এই ব্যবস্থার ফলে কাব্য নাট্য সাহিত্য কি রূপ পেয়েছে, অতীতের চেয়ে কত প্রাণবন্ত হয়েছে তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন না, ভাষা জানি না বলে কোন বই পড়ে দেখতে পারিনি। তবে আধুনিক সাহিত্যের ঝোঁক যে সমষ্টি-সার্থকতার দিকেই হবে, তা বোঝা শক্ত নয়। আধুনিক সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্য যে খুবই প্রাণবন্ত হয়েছে তার পরিচয় সর্বত্রই পেয়েছি। সমবেত নৃত্য যা আমরা দেখেছি, তার অধিকাংশই লোক-নৃত্য। সুতরাং তাতে বিদেশী প্রভাবের কোন পরিচয় পেলাম না। কিন্তু আধুনিক সমবেত সঙ্গীতে বিদেশী প্রভাব লক্ষ্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সমবেত সঙ্গীত সম্প্রদায়-গুলিকে বর্তমানে কোরিয়ার সৈনিকদেরকে আনন্দ পরিবেশন করতে যেতে হয়। সামরিক সুরের প্রয়োজন তাতে হয়—পথে, প্রান্তরে, রণক্ষেত্রে, গান গেয়ে সৈনিকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হয় বলে। তা ছাড়া, ফ্যাক্টরির কর্মীদেরকে, পল্লীর কৃষকদেরকেও উদ্দীপিত করবার প্রয়োজন হয় বলেই। কিন্তু সমবেত লোক-সঙ্গীত যা শুনেছি, তাতে বাইরের প্রভাব লক্ষিত হয়নি।

কোন শিল্প-প্রয়াসকেই ওপর থেকে ফরমাশ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা আর হয় না, শুধু শিল্পীদের সঙ্গে গণ-সংযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়া

হয়। জনগণের জীবনকে জেনে তাকে রূপায়িত করতে সক্ষম হবেন যে শিল্পী, অথবা যে শিল্পী জন-সংশ্রব থেকে এমন কিছু আবিষ্কার করে তার এমন রূপ দিতে পারবেন যা জনগণের মনোহরণ করবে, সেই শিল্পী জন-সংবর্ধনা পাবেনই এবং তাঁর সাধনার সার্থকতা তাতেই। অবশ্য তাঁর সৃষ্টিকে শিল্পও হতে হবে এবং জনোন্নতির সহায়কও হতে হবে। শিল্পীদের কাছ থেকে এই যে গুরুতর দাবি করা হয়, এর জন্য শিল্পীদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃসহ চিন্তা দূর করবার দায়িত্ব সরকারও যেমন গ্রহণ করেন, তেমন করেন ট্রেড-ইউনিয়ন। নিশ্চিন্ত থেকে শিল্প-সাধনার এই যে সুযোগ দেওয়া, এ কিন্তু আসলে নবসংস্কৃতি-লব্ধ নতুন সভ্যতা।

আমরা চীনের আধুনিক কবিতা উপন্যাস নাটক যেমন পড়তে পারিনি, তেমন আধুনিক নাট্যাভিনয় দেখবারও সুযোগ পাইনি। আমরা যখন ওখানে ছিলাম, তখন গরমের ছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে। ও-সময়ে ওখানকার নাট্যশালার অভিনয় বন্ধ থাকে। তবুও আমাদেরকে দেখাবার জন্য বিভিন্ন শহরে কতগুলি ক্লাসিক অপেরা এবং লোকো-অপেরা দেখানো হয়েছিল। সেগুলো দেখানো সম্ভব হলো, আধুনিক নাটক দেখানো কেন সম্ভব হোল না, এ প্রশ্ন আমি করেছিলাম। জবাব পেলাম, গরমের ছুটিতে অভিনেতারা দশ দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। তা ছাড়া, কোরিয়ায় গিয়েছেন পাঁচ শত, সৈনিকদেরকে আনন্দ দেবার জন্য; বুখারেস্টে যুব উৎসবে গিয়েছেন দুই শত। তাঁরাই আধুনিক নাটক অভিনয় করেন। সমস্যাটা বুঝলাম। কিন্তু ইউথস্ প্যালেস বা ওয়ার্কার্স প্যালেসে যে-সব শ্রমিকরা অভিনয় করে থাকেন, তার দু-একটা দেখলেও বুঝতে পারতাম নব-সংস্কৃতি আধুনিক নাটককে কতটা রূপান্তরিত করেছে। আমাদের দুরদৃষ্টবশত তাও দেখতে পাইনি। পিকিংয়ে নতুন নাট্যকার, ড্রামা রিসার্চ এসোসিয়ে-

শনের ডিরেক্টার প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করেও নাট্যপ্রগতির ধারাটা আমি ঠিক ধরতে পারিনি, যদিচ অনেকের মুখেই শুনেছি একখানি সফল আধুনিক নাটক যে নাট্যশালায় অভিনীত হয়, সে নাট্যশালায় তিন-চার মাসের মধ্যে আসন সংগ্রহ দুষ্কর হয়ে ওঠে। লোকো-অপেরায় আধুনিক নাট্য-প্রয়াস কিছু কিছু দেখতে পেয়েছি। তাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রধানত বর্তমান বিবাহ-আইন। এই আইনটি বহুদিনের সামাজিক ব্যাধি দূর করবার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। অসংখ্য নর-নারী, বিশেষ করে নারী, এই বিবাহ-আইনের কল্যাণে নব-জীবনের সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু অগণ্য নর-নারী এখনো এর প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই এর সুপ্রচার প্রয়োজনীয় হয়েছে। লোকো-অপেরায় আমরা এই রকম ক'খানি নাটক অভিনীত হতে দেখেছি। এই অপেরাগুলিতে সঙ্গীত-বাহুল্য দেখা গেলেও এদেরকে আধুনিক অবশ্যই বলা যায়। আধুনিক নাটকে সঙ্গীতের স্থান হতে পারে না, এমন কথা আমি মনে করি না। আধুনিক জীবন সঙ্গীত বর্জন করেনি—আধুনিক নাটকই বা প্রয়োজন হলে তার স্থান করে দেবে না কেন? অবশ্য অপ্রয়োজনে তার স্থানও করে দেবে না।

নাটকের ধারা কোন্ খাতে বয়ে চলেছে, তার কিছু হদিস পেয়েছি চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা মি ল্যান-ফাঙের সঙ্গে আলাপ করে এবং তার একটি প্রবন্ধ পড়ে। পিকিং অপেরার শত-শত বছরের ঐতিহ্য রয়েছে। তাই পিকিং অপেরার ধারার কিছুমাত্র পরিবর্তন করা হয়নি। জনগণের এই ক্লাসিক সৃষ্টিসমূহের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি রয়েছে বলে এগুলি জাতীয় শিল্প-প্রয়াস বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই ধরনের অপেরার চারজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে রাষ্ট্রের পোলিটিকাল কনসালটেটিভ কমিটিতে সসম্মানে স্থান দেওয়া হয়েছে।

ড্রামাটিক রিসার্চ এসোসিয়েশন, নানা স্থানের আর্ট য়্যাণ্ড কালচার

এসোসিয়েশন, এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল থিয়েটার্স নিষ্ঠার সঙ্গে নাটক সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন এবং নাটককে জাতীয় প্রয়োজনের পরিপুরক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করছেন। সাহিত্য চিত্র ও ভাস্কর্য সম্বন্ধেও এই প্রয়াসই চলছে। ফল কতটা কি হয়েছে, সাহিত্য না পড়তে পারলে তা বোঝা যায় না; নাটক চিত্র ভাস্কর্য চোখে না দেখলে জানা যায় না। এক বছরে দেশময় অনেক বাড়ি করা যায়, দু'বছরে একটা ওয়াটার রিজার্ভয়ার সৃষ্টি করা যায়, পাঁচ-বছরের আগে পাঁচসালা পরিকল্পনা পূর্ণ করাও সম্ভব, কিন্তু দু-দশ বছরে সাহিত্য শিল্প গড়ে তোলা যায় না; অন্তত কী রূপ ধরে গড়ে উঠেছে তার চমকপ্রদ পরিচয় যখন তখন পাওয়া যায় না। পাঁচসালা শিল্প-পরিকল্পনা যে প্রয়োজন পুর্ণ করে, সাহিত্য শিল্পকে তার চেয়েও অনেক গুরুতর এবং গভীরতর প্রয়োজন পুর্ণ করতে হয়। তাই সাহিত্য এবং শিল্পের বিচারে তার প্রগতির ধারা বিচারই বড় হয়ে ওঠে। ধরে নেওয়া হয় সামাজিক ব্যবস্থা যদি অনুকূল থাকে, তা হলে যে ধারায় শিল্প সাহিত্য বয়ে চলেছে তা জাতিকে নানা সম্পদ দিতে দিতেই এগিয়ে যাবে। যদি কখনো সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিকূল হয়, সাহিত্য ও শিল্পের ধারা ভিন্ন খাতে বয়ে যাবেই। সাহিত্য ও শিল্পের ধর্মই হচ্ছে প্রগতি। তাই বিদ্রোহের বিপ্লবের আগমনী আগে সাহিত্য ও শিল্পের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায়। রাজনীতি সংরক্ষণশীল। সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে উদাসীন রাজনীতি প্রগতিশীল হয় না। মার্কস সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন কি রাজনীতি প্রচার করেছেন, সে প্রশ্ন অবশ্য উঠতে পারে। লেনিন দুই-ই করেছেন, স্তালিনও তাই, মাও সে-তুঙও তাই। তাই রাজনীতিকে তাঁরা প্রগতিশীল রেখেছেন।

এই প্রগতি ওদের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতিগুলিকে পরিপূর্ণ সোশ্যালিজম-এর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মূল কথা বাঙালী

মহিলা-কবির একটি বাক্য দিয়ে বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। তা হচ্ছে—"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" কবি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কথাটি অত সহজভাবে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন এই কারণে যে, ওই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি—এমন কি, জাতিভেদ যে ভারতীয়রা করেছিলেন, তাঁদেরও ওই সংস্কৃতি ছিল। ওকে রূপ দেবার অনুকূল রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং আর্থনীতিক ব্যবস্থা করবার প্রয়াস যদি বারবার বাইরে থেকে আসা সাম্রাজ্য-প্রয়াসী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ব্যাহত না হতো, তাহলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীনতম সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্রের জীবন্ত নিদর্শন হয়ে থাকতে পারত।

নয়া চীনের রাষ্ট্রপতি মাও সে-তুঙের উক্তি 'সব ফুল সমানে ফুটে উঠুক' হচ্ছে নব সংস্কৃতির প্রকাশ। চীনের অতীত দিনে ও-আদর্শ নিশ্চিতই কখনো জাতীয় চিত্তে রঙ ধরিয়েছিল। নইলে কেবল মাও সে-তুঙের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে বলেই যে ও-কথা সকলের চিত্তগ্রাহী হয়েছে তা নয়। মাও সে-তুঙ আরো অনেক কথা বলেন। সব কথা কি অত সহজ স্বীকৃতি ও সম্মতি পায়? আমার মনে হয় পায় না; সংশয় থাকে, প্রশ্ন থাকে, যা সমাধান করবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে অবিরত নানা প্রয়াসে নিযুক্ত থাকতে হয়। ওই সকল ফুলকে ফুটিয়ে তোলবার বাণী এবং সেই বাণীকে রূপ দেবার প্রয়াসই হচ্ছে নয়া চীনের সাংস্কৃতিক প্রয়াস। চীনের রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য এবং সকল প্রকার শিল্পই (আর্ট ও ইণ্ডাস্ট্রি) সমবেত প্রয়াস দ্বারা সকল মানুষ-ফুলকে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে। আর চীন বুঝেছে যেমন স্বদেশের অভ্যন্তরে, তেমন সারা পৃথিবীতেও, শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া না থাকলে কেবল চীনেরই নয়, কোন দেশেরই মানুষ-ফুল ফুটে ওঠবার অবকাশ পাবে না। তাই বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠাও নয়া চীনের সাংস্কৃতিক প্রয়াসের একটি বলিষ্ঠতম প্রকাশ।

ট্রেড ইউনিয়ন

নয়া চীনের আজকার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সংগঠন। যেমন তেমন সংগঠন নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে যে সংগঠনের ফলে, সেই সংগঠন। পাঁচ বছর পুর্ণ হবার আগে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যাতে পুর্ণ করা যায়, তারই জন্য বর্তমান চীন প্রবল শক্তি নিয়োগ করছে। অবশ্য এই পরিকল্পনাও পুর্ণ সমাজতন্ত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে গড়া হয়েছে। চীনের সুবিধে হচ্ছে এই যে, চীনরাষ্ট্রের নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টির আয়ত্তে থাকলেও অ-কমিউনিস্টদের গবর্নমেণ্টে এবং সমাজব্যবস্থায় স্থান রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলতে যা বোঝায়, চীনে বর্তমানে সে শাসন-পদ্ধতি চালু নেই। সর্বদলের সম্মতিক্রমে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, আপাতত তাই কর্তব্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। কাজেই সংগঠন সম্পর্কে কোন বিরোধ নেই। জাপানী আক্রমণে এবং চিয়াং কাইশেকের কুশাসনে চীনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবন যদি না টুকরো-টুকরো হয়ে যেতো, তাহলে সর্বদলের সম্মতি সম্ভব হোত না। তেমনই তা সম্ভব হোতনা যদিনা চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জাতির বাস্তব-জীবন বুঝে কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হতেন। যে শক্তি প্রয়োগ করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জাপানকে তাড়িয়েছেন, চিয়াংকাইশেককে বহিষ্কৃত করেছেন, প্রতিক্রিয়া-পন্থীদের নিষ্ক্রিয় রেখেছেন—সেই শক্তি-প্রয়োগে তাঁরা অপর দলের অস্তিত্ব

অবশ্যই লোপ করে দিতে পারতেন। কিন্তু দেশের বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁরা রাষ্ট্রের রূপ দিতে চেয়েছেন বলে জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল দলগুলি সবলে বিলোপ করতে চাননি। তাঁরা বুঝেছেন সমাজতন্ত্র রূপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে জাতির এই প্রগতিশীলকামী দলগুলি স্বাভাবিকভাবেই সর্ববৃহৎ দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে। সব কিছু আত্মস্থ করবার ব্যগ্রতা চীন কমিউনিস্ট পার্টির নেই; ধৈর্য আছে, বিশ্বাস আছে জাতি-শতদলকে দলে দলে ফুটে ওঠবার সুযোগ করে দিলে তা স্বরূপও পাবে, সৌরভও ছড়াবে। বস্তুত চীনের রাষ্ট্রীক এবং সামাজিক প্রয়াস দেখে এই কথাটিই আমার মনে হয়েছে যে, জোর করে ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে দিয়ে জাতিকে প্রপীড়িত বিব্রত না করে জাতিকে স্বাভাবিকভাবে ফুটে ওঠবার সহায়তাই করা হচ্ছে। নায়করা এবং কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমত মানুষকে তার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলছেন, আর দ্বিতীয়ত তার পুর্ণ বিকশিত হবার নানা বাধা দূর করে দিয়ে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। সোবিয়েতে কি হচ্ছে, তা আমি জানি না—তবে আমি মনে করি মানুষের এই অনন্ত-সম্ভাবনা স্বীকার করে নেওয়াতেই কমিউনিজম-এর বড় সার্থকতা।

চীন কমিউনিস্ট-প্রধান রাষ্ট্র। কিন্তু চীন তার শাসন-কাঠামোতে প্রগতিপন্থী অপরাপর দলের প্রতিনিধিদেরকেও সাদরে গ্রহণ করেছে এই করেণে যে জাতি তাতে করে পুর্ণ বিকশিত হবার সুযোগ পাবে। এমন শক্তিমান লোকও চীন গবর্নমেণ্টে আছেন, যিনি মুক্তি-সংগ্রামে কমিউনিস্ট অভিযাত্রীদেরকে সসৈন্যে বাধা দিয়েছেন, কমিউনিস্টদের দ্বারা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন, এবং তারপর স্বীকার করেছেন যে, কমিউনিস্টরা জাতিকে যে-ভাবে গড়তে চাইছেন, তা জাতির পক্ষে সত্যই হিতকর। তিনি বর্তমানে মন্ত্রী পরিষদের

একজন সদস্য। জাতি গঠনের একটা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব আজ তাঁর ওপর ন্যস্ত। ভদ্রলোক মুক্তির আগে ছিলেন একজন সমরনায়ক।

চীনে শ্রমিকের সংখ্যা কত, তার হিসেব আমার জানা নেই। শুধু জানা আছে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যের সংখ্যা এক কোটি। সকল শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নয়। প্রতি চার-পাঁচজনায় যদি একজন করে সদস্য থাকে, তাহলে অনুমান করা যায় চার-পাঁচ কোটি শ্রমিক বর্তমানে সংগঠনের কাজে নিযুক্ত আছে। মাত্র দুটি নদী-পরিকল্পনায়েই দেড়লক্ষ শ্রমিক দিবা-রাত্র কাজ করছে। দেশময় কত রকমারি কাজই চলছে। যন্ত্রের অভাব পূরণ করতে হচ্ছে মানুষের দৈহিক শক্তিপ্রয়োগে এবং সঙ্কল্প নেওয়া হয়েছে যে, পাঁচ বছর পূর্ণ হবার আগে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা পূর্ণ করতে হবেই। কাজেই শ্রমিকের সংখ্যা দিন-দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাকি লোকেরা, নানা শ্রেণীর শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, ডাক্তার, লেডি-ডাক্তার, নার্স, ধাই, দোকানদার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চকর্মী, নর্তক-নর্তকী, লেখক-লেখিকা, চিত্রী, সাংবাদিক এবং জাতীয় পুঁজিপতি অর্থাৎ ব্যক্তিগত অর্থ নিয়োগ করে অথচ কেবল ব্যক্তি-স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রেখে যারা ব্যবসা চালায়, নিজেদের কারখানায় জাতির প্রয়োজনীয় মাল উৎপাদন করে, তাদের সবারই যেমন সমাজে সমান স্থান রয়েছে, তেমন সবারই প্রতিনিধি রয়েছে ন্যাশনাল পোলিটিকাল কনসালটেটিভ কনফারেন্সে—যাদের পরামর্শ এবং সুপারিশ ছাড়া রাষ্ট্রের কোন কাজ করা হয় না।

এই সব প্রতিনিধি তাঁদের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে নিজ-নিজ বৃত্তি-সংশ্লিষ্ট-বিষয় সম্বন্ধে যে পরামর্শ দেন, মন্ত্রী-পরিষদ অথবা কেন্দ্রীয় পিপলস্ গবর্নমেণ্ট কাউন্সিল তা অগ্রাহ্য করেন না। তাঁরা

জানেন, রাষ্ট্র চালাতে হলে লেখকদের, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের, গায়ক-গায়িকাদের এবং সকল শিল্পীদের, চিকিৎসকদের, ব্যবসায়ীদের সাহায্য ও সহযোগ চাই-ই, কেবল কৃষকদের আর শ্রমিকদের সহযোগিতায় অথবা নেতৃত্বে রাষ্ট্র শতদলের মতো ফুটে উঠবেনা। চীনে পেশাদার উকিল নেই, তাই উকিলের নেতৃত্ব নেই। নিছক বক্তারও প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ নেই। প্রতিনিধি পাঠাবেন ইউনিয়ন কাজের ও নেতৃত্বের বিচার করে। সরকার প্রতিনিধি মনোনীত করবেন না।

রাজনীতিক ভুবড়ি-বাজী খেলবার বিলাসিতা করবার অবসর চীনের নেই। আলোচনা আছে, বক্তৃতা নেই। কমিটি আছে, পার্লামেণ্ট এসেম্‌ব্লি নেই। সম্মত কাজকে সফল করবার প্রয়াস আছে, বাক-চাতুরিদ্বারা বুদ্ধি জাহির করবার প্রশ্রয়তা নেই।

প্রয়াস যেমন রাষ্ট্রের আছে, তেমন প্রয়াস রয়েছে ট্রেড ইউনিয়নের। রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি ব্যয় করছেন সর্ববিধ নির্মানের জন্য। তারপরই সর্বাধিক ব্যয় হচ্ছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির খাতে। ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা আগেই বলেছি, এক কোটি। এদের মাসিক আয়ের শতকরা পাঁচ অংশ ট্রেড ইউনিয়নের আয়। এই বিপুল অর্থ ব্যয় হয় সকল শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য। শহরে শহরে যেমন ট্রেড ইউনিয়নের বড় বড় নিজস্ব বাড়ি আছে, তেমন ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত শ্রমিকদের কৃষ্টি প্রাসাদ আছে, হাসপাতাল আছে, স্বাস্থ্যনিবাস আছে, শ্রমিকপল্লী আছে, শ্রমিক কল্যাণকর বহুবিধ প্রতিষ্ঠান আছে। এ-রকম বহু প্রতিষ্ঠান আমরা দেখেছি। তাদের পরিচালকরা আমাদেরকে তাদের ইতিহাস বলেছেন, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখিয়েছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রতিদিন সকালে তিন ঘণ্টা সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল আমরা এই রকম এক একটি

প্রতিষ্ঠানে থাকতাম। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

আগেই বলি সাংহাই শ্রমিক কৃষ্টি প্রাসাদের কথা। বাড়িটি ছয়-তলা। মুক্তির আগে এই বাড়িটি ছিল বিদেশীদের হোটেল। হোটেলের ঠিক সামনেই ছিল ঘোড়দৌড়ের ময়দান। মুক্তির পর ঘোড়-দৌড়ের ময়দানটিকে পিপল্‌স স্কোয়ারে পরিবর্তিত করা হয়েছে আর হোটেলটিকে করা হয়েছে শ্রমিকদের কৃষ্টি প্রাসাদ। প্রাসাদের মতোই তার রূপ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তক-তকে ঝক-ঝকে মূল্যবান আসবাবপত্র। এই সৌধে প্রেক্ষাগৃহসমন্বিত মঞ্চ আছে, নৃত্যশালা আছে, সঙ্গীত-আসর আছে, বাদ্যযন্ত্র আছে, একজিবিশন আছে, পাঠাগার আছে, আলোচনা বৈঠকের আসর আছে; যেসব খেলা ঘরে বসে খেলা যায়, সেই সব খেলার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যহ বেলা দেড়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমাদের দ্বার খোলা থাকে। যে শ্রমিকরা এই প্রাসাদে তাদের অবসরকাল অতিবাহিত করতে বিভিন্ন সময়ে সমবেত হয়, তাদের সংখ্যা গড়ে দিন প্রতি দশ হাজার। তারা এখানে অভিনয় করে, গান করে, নাচে, খেলা করে, বই পড়ে, এখান থেকে বই বাড়িতে নিয়ে যায়, জীবন সম্বন্ধে জাতি সম্বন্ধে আলোচনার বৈঠক বসায়, একজিবিশন দেখে—রুচিভেদে পৃথক পৃথক কাজ করে। এখানে বছরে গড়ে একশতটি নাট্যাভিনয় হয়। অনেক অভিনীত নাটক শ্রমিকদেরই রচনা। খ্যাতনামা নাটকগুলিও শ্রমিকরা অভিনয় করে; আবার খ্যাতনামা নাট্যসম্প্রদায়গুলিও মাঝে মাঝে এখানে এসে অভিনয় করে যান। তখন প্রবেশমূল্য নেওয়া হয়। কিন্তু কোন আসনের মূল্যই চার-আনার বেশি করা হয় না। বছরে আশি হাজার থেকে এক লাখ নরনারী এই প্রাসাদে অনুষ্ঠিত অভিনয় দেখবার সুযোগ পান। নাচের আসরে শ্রমিক যুবক-যুবতীরা নিজেরা

প্রত্যহ যেমন নৃত্য করে, তেমন দেশের বিখ্যাত নৃত্য সম্প্রদায়গুলিকেও আমন্ত্রণ করে আনে ক্লাসিক্যাল নৃত্য, লোক-নৃত্য, এক্রোবেটিক, অপেরা নৃত্য দেখাবার জন্য। শ্রমিকরা নানারকম কর্ম-নৃত্য নিজেরাই তৈরি করে। একক গান, সমবেত গান—আধুনিক, ক্লাসিক, ফোক—সর্বপ্রকার সঙ্গীতচর্চা করবার সুযোগ এখানে দেওয়া হয়; দেশী ও বিদেশী সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করবার অভ্যাসের ব্যবস্থাও এখানে রয়েছে। বেহালা, চেলো, পিয়ানো, এরা আধুনিক গানে বেশি ব্যবহার করে—ক্লাসিক কি লোক-সঙ্গীতে আদৌ করে না। ওদের বেলায় পুরোপুরি দেশী বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহার করা হয়। ঘরে বসে খেলবার নানা সরঞ্জাম চীনের নিজেরই আছে, বিদেশী খেলাও খেলে। তাস দাবা প্রায়ই দেখা যায়, টেবিল টেনিসও বেশ জনপ্রিয়।

প্যালেসের বড় বড় ঘরে যে প্রদর্শনী রয়েছে, তাতে বিশেষ করে দুটি বিষয় দেখানো হয়। প্রথমত শ্রমিকরা যে সব যন্ত্র আবিষ্কার করেছে অথবা রূপান্তরিত করে উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে, তার নানা মডেল। দ্বিতীয়ত কারখানায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে নতুন নতুন ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তারও মডেল। তৃতীয়ত থাকে, ছবিতে-বাণীতে প্রকাশিত শ্রমিক-সংগ্রামের শ্রমিক-প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক কাহিনী, কমিউনিস্ট অভ্যুদয়ের বিবরণী। বড় বড় হল ভর্তি রয়েছে আকাবাঁকা স্ক্রীন পার্টিশনের দু'পিঠে লাগানো এইসব ছবি, বিবরণী, গ্রাফ, সংখ্যা। শহীদদের পরিচয় ও তাদের জীবনীও এখানে রয়েছে। তাঁদের শেষ বাণীও এখানে লাল হরফে লেখা দেখতে পাওয়া যাবে। তেমনই দেখতে পাওয়া যাবে জন-জাগরণ রোধ করবার জন্য যুগে যুগে যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার চিত্র, তার বিবরণী।

এই প্রদর্শনী গৃহগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে আমাদের দু'ঘণ্টার ওপর

সময় লেগেছিল, যদিচ আমরা খুঁটি-নাটি বুঝে নেবার সময় দিতে পারিনি। এই প্রদর্শনীতেই দেখলাম সাংহাই-এর বিখ্যাত শহীদ ট্রেড ইউনিয়নের নায়ক ওয়াং সিয়াও হো'র ছবি। কুয়োমিনটাং পুলিস তাঁকে বধ্যভূমিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার আগে তিনি তাঁর পিতামাতাকে যে শেষ চিঠিখানি লিখেছিলেন, তাও এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। চিঠিখানির মর্ম এই :

"আমাকে তোমরা মানুষ করেছিলে বলে আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। পেছনে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি মানুষের মতো বাঁচতে যে চেয়েছিলাম, তা ব্যর্থ হয়নি। মানুষের মতোই আমি আমার জীবন যাপন করেছি। আমার মৃত্যুতে তোমরা শোকে অভিভূত হয়োনা। আমার প্রতি অবিচার খুবই হোলো সত্য, কিন্তু মৃত্যু আমাকে গৌরব দেবেই। আমার মেয়ে চীনকে বোলো, আর আগত সেই সন্তান যে আজও আসেনি তাকেও বোলো, কেন, কি কারণে, কিসের জন্য, তাদের বাবাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হোলো। আমার মৃত্যু কেবল আমারই জীবনের একটি ঘটনা। সমগ্র সমাজের তাতে কতটুকু ক্ষতি? লক্ষ লক্ষ লোক এখনো বেঁচে রইল, যারা মানুষের কল্যাণ কামনা করে, মানুষের প্রতি মানুষের ন্যায়বিচারের দাবি রাখে। আমার মৃত্যুর ক্ষতি তারাই পূর্ণ করবে। প্রতিশোধও নেবে তারা।"

ছোট-বড় অনেক শহীদের মর্মবাণী এই প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া যাবে। নতুন কর্মীরা, সবে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে সেই সব তরুণ-তরুণীরা, এই প্রদর্শনী প্রত্যহ দলে দলে ঘুরে ঘুরে দেখে। তারা জাতিকে বড় করবার, জাতির মানুষকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেবার সঙ্কল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। যে দশ হাজার শ্রমিক-নরনারী প্রত্যহ এই প্রাসাদে সমবেত হয়, তারা প্রত্যেকেই প্রত্যহ কিছু এই প্রদর্শনী দেখে না; কিন্তু নতুন যারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, সংগঠনে যারা নতুন করে নিয়োজিত হয়, এই প্রদর্শনীকে তারা তীর্থস্থানের মতোই মনে করে। এর সার্থকতাও সেইখানে।

প্রাসাদের লাইব্রেরিতে ৭৮,০০০ খণ্ড বই আছে। দৈনিক ৩,০০০ পড়ুয়া সেই বই প্রাসাদে বসেই পড়ে অথবা বাড়িতে নিয়ে যায়। শিশুদের উপযোগী বইও প্রাসাদে রাখা হয়। তা ছাড়া বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা সিন হুয়া প্রাসাদে একটি শাখা স্থাপন করেছেন। এই দোকান থেকে শ্রমিকরা বই কেনেন। লাইব্রেরি যেমন আছে, তেমন আছে চিত্র-গ্যালারি। শুধু চীনের শিল্পীদেরই আঁকা ছবি সেখানে থাকে না। জাপানী কাঠখোদাই দেখা গেল, চেকোশ্লোভাক ব্যঙ্গ-চিত্র দেখা গেল, সোবিয়েত-চীন বন্ধুত্বব্যঞ্জক ছবি দেখা গেল, শ্রমিকদের আঁকা ছবিও অপ্রতুল নয়।

বক্তৃতা-বৈঠকে বক্তৃতা করতে আসেন সাহিত্যিক, আসেন বৈজ্ঞানিক, আসেন খ্যাতনামা গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সমাজকর্মী। শুনলাম বড় বড় বক্তৃতার আসর দু'বছরে ছিয়ানব্বইটি এই প্রাসাদেই বসেছে। বক্তৃতার বিষয় জানা গেল—চীনের ভূগোল, শ্রমিক-ধনিক সম্পর্ক, ভূমি-সংস্কার, কোরিয়া যুদ্ধ, সাহিত্যের ধারা, অভিনয়ের মর্মকথা, শান্তি ও সংগ্রাম, মাও সে-তুংএর দার্শনিক প্রবন্ধ, নতুন যন্ত্র আবিষ্কার, প্রভৃতি। সাংহাই শহরের বিভিন্ন অংশে পৃথক পৃথক ওয়ার্কার্স প্যালেস থাকলেও এইটিই হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। এত বড় না হলেও প্রত্যেক শহরেই এই রকম ওয়ার্কার্স প্যালেস, এরই মতো ইউথ্‌স্ প্যালেস অনেক রয়েছে। এদেরই সহায়তায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হচ্ছে, জাতির তরুণ-তরুণী জীবনের প্রেরণা পাচ্ছে। এই সব প্যালেস পরিচালনা করেছেন ট্রেড ইউনিয়ন যার প্রধান কাজ হচ্ছে সর্বপ্রকার উৎপাদনবৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের দৈহিক, মানসিক এবং আর্থিক উন্নয়ন এবং তাদের স্বার্থরক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধি।

সাংহাইতে একটি শ্রমিক পল্লীও দেখতে গিয়েছিলাম। এরকম পল্লী গড়ে তোলবার ভারও ট্রেড ইউনিয়ন নিয়েছেন। এবং কারখানা

অঞ্চলে অবিরত এই রকম পল্লী গড়ে তুলেছেন। সাংহাই শহরের আশেপাশে এই রকম নানা পল্লী গড়ে উঠেছে এবং গড়া হচ্ছে। আমরা যে পল্লীটি দেখতে গিয়েছিলাম তার নাম দেওয়া হয়েছে 'সূর্যমুখী' পল্লী। সারি সারি দোতলা পাকা বাড়ি, ওপরে চীনা-টালির ছাদ। বাড়িগুলি এমনভাবে নির্মিত যে সব ঘরেই সূর্যের আলো পড়ে। পল্লীটির নাম তাই সূর্যমুখী, ওদের পরিচয় 'ফেসিং দি সান্ শাইন'। প্রতি তলায় তিনটি করে শ্রমিক পরিবারকে স্থান দেওয়া হয়। প্রতি তলার পরিবারের রান্নাঘর খাবারঘর এক, কিন্তু বাথরুম স্বতন্ত্র। বাড়িভাড়া দিতে হয় বেতনের শতকরা পাঁচভাগ। ইলেকট্রিক ও জল ওতেই পাওয়া যায়। শুধু প্রত্যেক বাড়িতে গরম জলের ব্যবস্থা নেই। সমগ্র পল্লীর জন্য গরমজল সরবরাহের চারটি জায়গা আছে। প্রয়োজন মতো সেখান থেকে জল আনতে হয়। এই সূর্যমুখী পল্লীতে চারটি প্রাইমারি স্কুল, একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, একটি নার্সারি, একটি ক্লাবঘর, একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র (নাচ গান ও অভিনয়ের স্থান, লাইব্রেরি সহ) একটি পিপলস্ ব্যাঙ্ক, চারটি ক্লিনিক, একটি ডাকঘর, তিনটি বাজার, তিনটি সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্নানাগার আছে। এই পল্লী থেকে কর্মীদেরকে কারখানায় নিয়ে যাবার এবং ফিরিয়ে আনবার জন্য পল্লীর নিজস্ব দুখানা বাস আছে। কিছু কিছু ফুলের বাগান কোন কোন বাড়ির সামনে দেখলাম, কিছু কিছু সব্জি বাগানও দৃষ্টিতে পড়ল। আমরা সূর্যমুখী পল্লী দেখতে গিয়েছিলাম বিকেলের দিকে। অনেক বাড়ির সামনে ডেক-চেয়ার বিছিয়ে কারখানা-প্রত্যাগত শ্রমিক দম্পতি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বসে আছেন দেখতে পেলাম। সময়াভাব বলে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে পারিনি। তাঁদের প্রসন্ন মুখ দূর থেকেই শুধু দেখে এসেছি। একথা সত্য যে চীনের সকল শ্রমিকের জন্য এরকম বাড়ি

তৈরি হয়নি। কিন্তু একথাও মিথ্যে নয় যে সর্বত্র এই রকম পল্লী গড়ে তোলা হচ্ছে। এই রকম একটি পল্লীর বিবরণ পড়েছি 'চায়না রিকনস্ট্রাক্টস্' কাগজে। বিদেশিনী লেখিকা মনিকা ফেলটন মুকদেনের শহরতলীতে যে শ্রমিক পল্লীটি গড়ে তোলা হচ্ছিল, তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পল্লী গড়ে তুলতে গিয়ে সেখানে একটি শহর গড়ে তোলা হচ্ছে। কেননা ৭০,০০০ হাজার শ্রমিকের জন্য সেখানে বাড়ি তৈরি হচ্ছে। তিনি যখন দেখেছেন, তখন ১৪,০০০ লোকের থাকবার মতো বাড়ি প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। যে দ্রুতগতিতে কাজ এগুচ্ছে বলে তিনি লিখেছেন, তা পড়ে অনুমান করা যায় এতদিনে হয়ত পল্লীটি গড়া শেষ হয়েছে এবং ৭০,০০০ শ্রমিক সেখানে সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। এখনো কত অভাব রয়েছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি অভাব দূর করা হচ্ছে। তিন বছরে দিনের সমষ্টি হচ্ছে এক হাজার পঁচানব্বই। ওই দিনগুলিতে লাখো লাখো শ্রমিকের জন্য আধুনিক পল্লী গড়ে তোলা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি দিনেই চীনের সমগ্র শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-পল্লী গড়ে তোলবার কাজ অতি দ্রুত এগিয়ে চলছে। এই কাজের নেতৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিকদেরই নিজস্ব ইউনিয়ন। যে দৃষ্টিকোণ থেকে ইউনিয়ন জীবনকে দেখেছেন, যে কর্মনিপুণতার পরিচয় দিচ্ছেন, তা থেকেই বোঝা যাবে চীনে শ্রমিকরা কত উন্নতি লাভ করেছেন।

ট্রেড ইউনিয়নের কাজের আর একটা পরিচয় দিচ্ছি। এটি তিনজিন জেনারেল ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত স্বাস্থ্য নিবাস। এরকম স্বাস্থ্য নিবাস অনেক যায়গাতেই দেখেছি। ১৯৫১ সালে এই স্বাস্থ্য নিবাসটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্তার ফুঙ-এর অধ্যক্ষ। সাধারণত যানবাহন শ্রমিকদের জন্যেই এটি গড়া হয়েছে। রোগমুক্তির পর

হাসপাতাল থেকে যাদেরকে ছুটি দেওয়া হয়, তারা সম্পূর্ণ কার্যক্ষম না হওয়া পর্যন্ত এই স্বাস্থ্য নিবাসে স্থান পায়। আমরা যখন দেখতে গিয়েছিলাম, তখন সেখানে ১৭১ জন রুগী ছিল। এদের সেবা করবার জন্যে ৯৪ জন স্টাফ ওয়ার্কার, ৯ জন ডাক্তার, ২৮ জন নার্স। বাড়িগুলি আধুনিকভাবে তৈরি, অর্থাৎ প্রচুর আলো-বাতাস ঘরে যাতে খেলতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রুগীদের থাকবার জন্য দুটি বিছানা-যুক্ত ঘর আছে, তিনটি বিছানাযুক্ত ঘর আছে, চারটি বিছানাযুক্ত ঘর আছে। ঘরের পরিসর বেশ বড়। এর পচ্ছিন্নতা মনকে প্রসন্ন করে। চিকিৎসার জন্যে রুগীদের কাছ থেকে কিছু নেওয়া হয়না, তবে খাবার জন্যে মূল্য বাবদ কিছু নেওয়া হয়। অন্য জায়গায় যে-দামে এক বেলার খাবার পাওয়া যায়, সেই মূল্য দিয়ে এখানে তিন বেলার খাদ্য পাওয়া যায়। এখানে সোবিয়েত দেশে টিস্থ-থেরাপির যে নূতনতম ব্যবস্থা করা হয়েছে, তারই অনুসরণে রুগীদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। ডাক্তার ফুঙ নিজেই এ সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। দু'তিন সপ্তাহ এই স্বাস্থ্য নিবাসে থাকবার পর রুগীদের প্রায় সকলেরই দেহের ওজন বাড়ে এবং তারা কার্যক্ষম হয়ে ওঠে। যারা তা হয় না, তাদেরকে আবার হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেবব্রত বিশ্বাস মোটা লোক, কিন্তু পেটের রোগে ভোগেন। আমাদের প্রোগ্রাম পরিচালনার এবং মঞ্চ-ব্যবস্থার ভার আমি তাঁর ওপর দিয়েছিলাম। কাজেই তাঁর স্বাস্থ্য আমার চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল। আমি ডাক্তার ফুঙকে তাঁর পেটের রোগের কথা শুনিয়ে পরামর্শ চাইলাম। সব শুনে ডাক্তার ফুঙ বল্লেন, তাড়াতাড়ি আর কি পরামর্শ দেওয়া যায়, তবে মিঃ বিশ্বাস রোজ সকালে খালিপেটে এক আউন্স পরিমাণ কাঁচা-আলুর রস খেয়ে দেখতে পারেন। তিনি শুধু ঐ দিয়েই অনেক রুগীর পেটের গোলমাল সারিয়েছেন। দেবব্রত অবশ্য এ

উপদেশ গ্রহণ করেন নি, প্রত্যহই লিভার সল্ট খেয়ে চলেছেন অথচ মোটাও হচ্ছেন। এই স্যানাটোরিয়ামে সপ্তাহে ছ'দিন করে নাচ-গানের আসর বসে। এবং মাঝে-মাঝে রুগীদের বাইরে চড়িভাতিতেও নিয়ে যাওয়া হয়। ফুলের বাগানের মধ্যে স্থাপিত সুনির্মিত ও সুন্দর এই স্বাস্থ্যাবাসটিতে পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা রুগী ও কর্মীদের দেখে মনেই হয় না যে এটি একটি আতুর-আশ্রম। কে একজন প্রস্তাব করলেন যে ভারতীয় প্রতিনিধিদল যদি দু'একটা গান শোনান, তাহলে রুগীরা খুব খুশি হয়। আমরা রাজী হলাম। তখুনি লাউড স্পীকারে প্রচারিত হোলো সেই বার্তা। সামনের প্রাঙ্গণে রুগীরা এবং কর্মীরা এসে সমবেত হলেন। সুরিন্দির কৌর পাঞ্জাবী লোকসঙ্গীত গাইলেন। সবাই খুশি। লোকসঙ্গীতের সুর শুনলেই চীনের শ্রোতৃদের মন নেচে ওঠে। তারপর আসামের রেলকর্মীদের গান শোনালেন দিলীপ শর্মা। রুগীরা আরো খুশি। মাদ্রাজের গোপালকৃষ্ণ একটি নাচ দেখালেন। মেয়েদের সেটা খুব ভালো লাগল। তারপর আমরা তাঁদের গান শুনতে চাইলাম। রুগীরা-কর্মীরা মিলে একটি সমবেত সঙ্গীত শোনালেন। চীনের আধুনিক তরুণ-তরুণীরা প্রায় সকলেই গান গাওয়া অভ্যাস করেন। ওঁদের গান শেষ হবার পরই হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই' গানটি গেয়ে শোনাবার অনুরোধ এলো। এই গানটি চীনে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। আমাদের প্রতিদিনকার প্রোগ্রামে বন্দেমাতরম্ গানটির মত এটিও গাওয়া হোতো। তা ছাড়া এ-গানটি সকল জলসায়, কারখানায়, হাসপাতালে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, রেলওয়ে প্লাটফর্মে বিদায় নেবার সময় গাওয়া হোতো—চীন তরুণ-তরুণীরাও তখন আমাদের গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। দেবব্রত, সুরিন্দির আর দিলীপ যখন এই স্বাস্থ্য নিবাসে গানটি গাইলেন, ডিরেক্টর, ডাক্তারেরা নার্সরা, কর্মীরা,

রুগীরা তালে তালে তালি দিতে লাগলেন। তাদের কী আনন্দ, কী উদ্দীপনা! ফুলের বাগিচার মাঝে সুরম্য বাড়ির সাম্নে পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত এতগুলি কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী প্রৌঢ়-বৃদ্ধকে এই সঙ্গীতোৎসবে মত্ত দেখে কে মনে করবে যে স্থানটি আসলে আতুরাশ্রম?

চীনের ট্রেড ইউনিয়ন চীনের শ্রমিক-রুগীদের তাড়াতাড়ি কার্যক্ষম করে তোলবার ব্যবস্থার জন্য এইরকম অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালিত এমন হাসপাতালও দেখেছি যেখানে দশটা এক্স-রে প্লাণ্টস আছে, বেদনাহীন প্রসব ব্যবস্থা আছে, ৩৮০ বেডের জন্য ৬৮টি ডাক্তার, ৬৯ জন নার্স, ৯৫ জন সহায়িকা নার্স এবং ৪৬৪ জন ছোট-বড় কর্মী কাজ করছে। নানা মিল ফ্যাক্টরির কর্মীদের জন্য এইরকম হাসপাতাল নানাস্থানে গড়া হয়েছে এবং প্রতিদিনই সংগঠন চলছে। সকলের সমবেত প্রয়াসে বর্তমানে চীনে নয় কোটি ষাট লক্ষ লোকের জন্য এখন বিনাব্যয়ে অথবা নামমাত্র ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়ন ইউনিভার্সিটিতে কী রূপ পেয়েছে তাও আজকার দিনে আমাদের বিশেষ করে জানা দরকার। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা হচ্ছে ১,৩০০। ৮০টি গ্রুপে এরা বিভক্ত। বছরে একবার করে প্রত্যেক ইউনিট থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি করে সপ্তাহব্যাপী প্রতিনিধি-সম্মেলন করা হয়। এই সম্মেলনে বিগত বছরের রিপোর্ট এবং পরিকল্পনার আলোচনা হয়। প্রতিনিধিরা সেই রিপোর্ট আর সেই পরিকল্পনা তাঁদের প্রত্যেক ইউনিটে নিয়ে গিয়ে আলোচনা করেন এবং ইউনিটের সিদ্ধান্ত জেনে নেন। তারপর নতুন একজিকিউটিভ কমিটির নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম সংগ্রহ করা হয় প্রতি ইউনিট থেকে। সকল গ্রুপের সমর্থন যারা পাবেন না, তারা শেষ

পর্য্যন্ত নির্বাচন-প্রার্থী থাকতে পারবেন না। নির্বাচন-প্রার্থী হিসেবে যাঁরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবেন তাঁদের মধ্যে থেকে ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যরা গোপন ব্যালটের দ্বারা একজিকিউটিভ কমিটি গঠন করবেন। এই একজিকিউটিভ কমিটি সাতটি সাবকমিটির সাহায্যে কাজ করেন। সংগঠন কমিটির কাজ নাম থেকেই বোঝা যায় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সদস্যদেরকে শ্রমিক-মনোবৃত্তিসম্পন্ন করে তোলা এবং ইউনিয়নের মর্যাদা রক্ষা করা। জীবিকানির্বাহ কমিটি সদস্যদের আয়ব্যয় বিচার করে দেখে স্থির করবে, কার মাইনে প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই বিচার করে বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করবে। যদি ইউনিয়নের কোন সদস্য কোন কারণে আর্থিক দুরবস্থায় পড়েন, ইউনিয়ন বিনা সুদে তাঁকে অর্থ দেবেন এবং বেতন থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে তা কেটে নেবেন। কোন গুরুতর দুর্ঘটনার জন্য যদি কোন সদস্য সহসা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন অথবা দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়ে থাকেন, ইউনিয়ন তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেন, যা আর তাঁকে ফেরত দিতে হয় না। প্রতি সদস্য যাতে বছরে একবার করে বিনা ব্যয়ে এক্স-রে পরীক্ষা করাতে পারেন, ইউনিয়ন তারও ব্যবস্থা করে থাকেন। বছরে দু'বার করে সদস্যদের জন্য পোশাক তৈরি ক'রে দেওয়া হয়। তাতে কম খরচায় পোশাক তৈরি হয়, দামটাও সদস্যদের কাছ থেকে কিস্তিবন্দী করে নেওয়া হয় ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের হিসেব করে। ইউনিয়ন ক্রেতৃ-সমবায়ের বাড়ি করে দিয়েছে, নারী কর্মীদের এসোসিয়েশনের ঘর করে দিয়েছে, নার্সারির যন্ত্রপাতি কিনে দিয়েছে। এই জীবিকানির্বাহ কমিটির সুষ্ঠু ব্যবস্থার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে নিরাপত্তা অনুভব করছেন এবং নিশ্চিন্ত থেকে কাজ করবার সুযোগ পাচ্ছেন। শিক্ষা এবং সংস্কৃতি কমিটির কাজ

হচ্ছে সদস্যদেরকে নয়াগণতন্ত্রের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন রাখা এবং নতুন যে সমাজজীবন গড়ে উঠছে, তাকে কেমন করে সুস্থ সবল ও উন্নত করা যায় সেই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা। এই কমিটির সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কর্মীরা (ছাত্র-ছাত্রী নয়) ১৯৫২ সালে গ্রাজুয়েট হয়েছে তাদের মাঝে পরিচারিকা আছে, ছুতোর আছে, রাঁধুনি আছে, ধোপানী আছে, পিওন আছে, কুলী আছে। এইসব কর্মী এই গ্রাজুয়েশন পাবার জন্য যে শিক্ষা গ্রহণ করেন, সে শিক্ষাদানে অধ্যাপকরা, ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের জন্য কোন পারিশ্রমিক নেন না। এই রকম শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা আছে। অধ্যাপক শিক্ষকদেরও আলোচনা বৈঠক আছে। শিক্ষা সংক্রান্ত যেসকল সমস্যা উদ্ভূত হয়, ইউনিট হিসেবে তাঁরা তার আলোচনা করেন এবং কার্যনির্বাহক সমিতির গোচর করেন। সদস্যরা যাতে অল্প দামে শহরের ভালো নাটকগুলি এবং ভালো ফিল্মগুলি দেখতে পারেন, ইউনিয়ন তার ব্যবস্থা করে থাকেন। সদস্যদের নিজেদের দুটি নাট্যসম্প্রদায় আছে। একটিতে ক্লাসিকাল অপেরা অভিনয়ের অভ্যাস করা হয়। অপরটিতে আধুনিক নাট্যাভিনয় অভ্যাস করা হয়। গানের আসর, খেলা-ধূলার আসর তো সর্বত্রই রয়েছে। ইউনিয়নের নিজস্ব লাইব্রেরিও আছে। ইউনিয়নের সদস্যরা সকল প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়াসে প্রত্যক্ষভাবে যাতে যোগ দিতে পারেন, ইউনিয়ন তারও সকল ব্যবস্থা করে থাকেন, ব্যয়ভারও বহন করেন।

চীনের ট্রেড ইউনিয়নের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের মতো পর্যটকদের পক্ষে সম্ভব নয়। মাত্র ছয় সপ্তাহকাল চীনে থেকে যা দেখেছি, শুনেছি এবং তাড়াতাড়ি পড়ে নিয়েছি, তাই মিলিয়ে, চীনের ট্রেড ইউনিয়নের কাজের কিছু পরিচয় দিলাম। এ থেকে অন্তত

এটুকু বোঝা যাবে যে ট্রেড ইউনিয়ন ব্যষ্টির দুঃখ, দৈন্য, প্রাত্যহিক দুশ্চিন্তা দূর করে, ব্যষ্টিকে বহুর সংগেই জড়িয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে ব্যক্তির পরিণতি বহুরই প্রতিষ্ঠায়। তাই হচ্ছে পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্র।

কৃষকের জীবন

"অবস্থাটা ভালো করে বুঝতে হলে একজন প্রাচুর্যে প্রসন্ন কৃষকের সঙ্গে তোমাকে মিশতে হবে। খুশিভরা মনে সে তোমার হাত ধরে তোমাকে নিয়ে যাবে তার কুটিরে; নিয়ে যাবে তার বিছানা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লেপ-তোষক যেখানে গুটিয়ে রাখা হয়েছে তার পাশ দিয়ে; নিয়ে যাবে তোমাকে তার চকচকে বাক্স-প্যাঁটরার ধার দিয়ে; নিয়ে যাবে তোমাকে তার ঘরে তোলা শস্য যেখানে স্তূপীকৃত রয়েছে সেইখানে। আঁজলা ভরে সে শস্য তুলে নেবে আর আঙুলের ফাঁক দিয়ে যাতে দানাগুলো গলে পড়তে পারে, তারই জন্য আঙুলগুলো সে বিস্তার করে দেবে। তখন তোমাকে চেয়ে দেখতে হবে তার প্রোজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে, চেয়ে দেখতে হবে তার মুখের শ্রম-চিহ্নকঠোর রেখাগুলি হাসির তরঙ্গে কেমন করে মিলিয়ে যায়। সে তোমাকেও আঁজলা ভরে শস্যদানা তুলে নিতে বলবে যাতে তুমিও প্রাচুর্যের আনন্দ অনুভব করতে পার। সেও তোমারই পাশে দাঁড়িয়ে বারবার তাই করবে। এই-ই তার প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রথম সঞ্চয়। এর মূল্য তার কাছে অশেষ, অভিনব। সে বলবে আমি জানি এ সম্পদ কেমন করে আমার গোলায় উঠল। আমি বুঝেছি পিপ্‌লস্‌ গভর্নমেণ্ট মানে কী। আমি স্থির জেনেছি আমাদের সুখের দিন শুরু হয়েছে।"

একবছর আগে মাদাম স্থঙ চিঙ-লিং (মিসেস সান ইয়াত সান) এসিয়ান ও প্যাসিফিক অঞ্চলের শান্তি সম্মেলনের ভাষণে ওই চিত্র এঁকে তুলেছিলেন ভাষা দিয়ে, আর একবছর পরে চীনে গিয়ে আমরা তা প্রত্যক্ষ করে এসেছি। সেই হাত ধরে কুটিরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া, সেই পরিচ্ছন্ন বিছানায় বসতে দেওয়া, সেই শস্য-সঞ্চয়ের পাশে নিয়ে যাওয়া। অতিরিক্ত যা পেয়েছে তা হচ্ছে চীনা কৃষক দম্পতির তৈরী চীনা চা এবং তাদের গরবের বস্তু নিজস্ব রেডিওতে শোনা গান। তাদের মুখে প্রসন্ন হাসি, কৃতজ্ঞতা-ভরা তাদের চোখের দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে টাঙানো চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের ছবির ওপর গিয়ে পড়ে। মাদাম স্থঙ চিঙ-লিংয়ের বিবৃতি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় না, নিঃসংশয়ে বলতে ইচ্ছে হয়—এই হচ্ছে আজকার চীনা কৃষকের অবিকৃত বাস্তব চিত্র।

কৃষকদের জীবন সম্বন্ধে বলবার অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করতে পেরেছি কিনা, সে-বিষয়ে এ-দেশের কেউ কেউ আমাকে সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। চীনে গিয়েছিলাম সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের নায়ক হয়ে। কাজ ছিল সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন এবং ও দেশের ওই দুটি শিল্প-মাধ্যমের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন। সময় ছিল মাত্র ছয় সপ্তাহ। অত বড় দেশের বিপুল সংস্কৃতির পরিচয় অত অল্প সময়ে কতটুকু পাওয়া সম্ভব তা অনুমান করে নেওয়া শক্ত নয়। তবুও ওই অল্প কালের মাঝে যত কিছু দেখা যায়, তা দেখবার চেষ্টা আমরা করেছি। আর আমাদের যাঁরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, নয়া চীনের সেই সংগঠয়িতারা যত বেশি দেখানো যায় তাই দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সে আগ্রহের যেমন তুলনা নেই, তেমন তুলনা নেই তাঁদের আদরের, যত্নের। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর, অধ্যাপক; কারখানার ডিরেক্টর, ম্যানেজার, দায়িত্বশীল কর্মী; জেলখানার, স্যানাটোরিয়ামের, ওয়ার্কার্স

প্যালেসের, নার্সারির ডিরেক্টর ও কর্মী ; সাহিত্য ও স্থকুমার শিল্পের নায়ক ; অভিনেতা, অভিনেত্রী, চিত্রী,—সকলেই পরম আগ্রহভরে আমাদেরকে তাঁদের প্রয়াসের সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য ছয় সপ্তাহের প্রতিটি দিন প্রত্যেক জায়গায় দৈনিক ছয়-সাত ঘণ্টা আমাদের নিয়ে ঘুরেছেন, আলাপ-আলোচনার স্থযোগ করে দিয়েছেন। সকাল সাড়ে আটটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত আমরা ব্যক্তিগত বিশ্রামের অবসর পেতাম মাত্র মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর এক ঘণ্টা। কাজেই গ্রাম্য জীবন ও কৃষকদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবার প্রচুর অবসর আমরা পাইনি। ওর জন্য যদি একটা ভিন্ন প্রতিনিধিদল পাঠানো যায় এবং দীর্ঘকাল ও-দেশে রাখা যায়, তাহলে সেই প্রতিনিধি-দলের সদস্তরা হয়ত কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, যদিচ চীনের মত বিরাট এবং বৈচিত্র্যময় দেশের সমগ্র পল্লী-অঞ্চল পরিক্রমাজাত অভিজ্ঞতা অর্জন কোন বিদেশী প্রতিনিধিদলের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, একটা জাতিকে জানবার এবং বোঝবার জন্য সামগ্রিক পরিক্রমার প্রয়োজন নেই। কোথায় কতখানি গলদ রয়েছে, অপূর্ণতা রয়েছে, প্রয়াস কী পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছে, তন্ন-তন্ন করে তারই সন্ধান বড় কথা নয় ;—বড় কথা হচ্ছে সমগ্র প্রয়াস কোন খাত বয়ে চলেছে, তাতে কতটা আন্তরিকতা রয়েছে, এবং সার্থক-প্রয়াসের কী রূপ সমগ্র সমাজ-জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে তাই বোঝা। পল্লীতে না গিয়েও, শহরে থেকেও, সমগ্র জাতির সাংগঠনিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়াস থেকে পল্লী-বাসীর জীবন বোঝবার উপাদান অবশ্যই পাওয়া যায়। শ্রুতির ওপরও অনেকটা নির্ভর করতে হয়। অবশ্য একদল লোক আছেন যাঁরা অনবরত বলছেন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের লোকরা বিদেশী লোকদের আমন্ত্রণ

করে নিয়ে গিয়ে কতগুলো তৈরি-জিনিস দেখিয়ে, আর কতগুলো মিথ্যে কথা শুনিয়ে নিজেদের কার্যোদ্ধার করিয়ে নেন।

প্রথমত একটা শক্তিমান প্রগতিশীল জাতির নায়কদের সম্বন্ধে এমন কথা বলা শুধু অশিষ্টাচার নয়, খুবই অন্যায়। দ্বিতীয়ত একটা প্রতিনিধিদলের সদস্যদের কতগুলো মিথ্যে কথা শুনিয়ে কী কার্যোদ্ধার তাঁরা করিয়ে নিতে পারেন? ভারতীয় কালচারাল ডেলিগেশনের নায়ক শচীন সেনগুপ্ত এমন কি মাতব্বর ব্যক্তি হলেন যে, তিনি যা বলবেন ভারতের লোকরা তাই বেদ-বাক্য বলে মেনে নেবেন? তিনি জন-নায়ক নন, তিনি রাষ্ট্রনায়ক নন, তিনি সমগ্র জাতি কর্তৃক প্রতিনিধিদলের দলপতি নির্বাচিত হননি। প্রতিনিধিদলও জাতির সমগ্র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নয়। এ-কথা যাঁরা প্রতিনিধিদলকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা জানেন। প্রতিনিধিদলের দলপতি এবং সদস্যরা কী রাজনৈতিক মত পোষণ করেন, আদৌ কোন রাজনৈতিক মত পোষণ করেন কিনা, সে-সম্বন্ধে আমন্ত্রণকারীরা দল-পতিকে বা সদস্যদেরকে কোনদিন কোন প্রশ্ন করেন নি। একটা কথা শুধু তাঁরা জানতেন। সে-কথা হচ্ছে যে, নিখিল ভারত শান্তি কাউন্সিল প্রতিনিধিদলটি গঠন করেছেন, আর দলপতি নির্বাচন করেছেন প্রতিনিধিরা নিজেরা। শান্তি আন্দোলন আর কমিউনিস্ট আন্দোলন যে এক নয়, এ-কথা যে চীন ভালো করেই জানে। কেননা চীন দুটোতেই দৃঢ় বিশ্বাসী এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সর্ব পর্যায়েই সে সক্রিয় সহযোগ করেছে। চীনের না জানবার কথা নয় যে, শান্তি পতাকা যাঁরাই হাতে তুলে নিয়েছেন, তাঁরা সকলেই কমিউনিস্ট নন। তাঁরা সকলে শান্তির স্বপক্ষে সাধ্যমত প্রচার করলেও কমিউ-নিজম প্রচার যে করবেনই, এমন ভরসা সকল কমিউনিস্টও করেন না। চীনও করে না। জনকত শিল্পীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে

কতগুলো মিথ্যে কথা শুনিয়ে, ভুয়ো জিনিস দেখিয়ে কোনই লাভ যে হতে পারেনা, চীন দেশের নায়করা তা যদি না বুঝতেন, তাহলে ঘোরতর দুর্দশা থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারতেন না। যে-যে বিষয়ে তাঁরা সাফল্য অর্জন করেছেন বলে মনে করেন, পরম আগ্রহ নিয়ে তাঁরা তা আমাদেরকে দেখিয়েছেন। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের পার্থক্য কী এবং কোথায়, তাই বুঝিয়ে দেবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা পরিশ্রম করেছেন। যে-বিষয়ে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি বলে তাঁরা মনে করেন, সহজভাবে তাও প্রকাশ করেছেন। আত্ম-প্রবঞ্চনা নয়, আত্ম-পরীক্ষা ওঁদের কাছে আজ বড় কথা। কেননা ওঁরা বুঝেছেন নিয়ত আত্ম-পরীক্ষা ছাড়া সংগঠনকে সফল ও সার্থক করে তোলা যাবে না। কমিউনিজম-এরও একটা বড় কথা হয়ত তাই। চীনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক নায়করা মানুষ হিসেবে এত ভদ্র এবং জাপানকে ও চিয়াংকাইশেকের কুয়োমিনটাংকে তাড়িয়ে এমনই আত্মপ্রত্যয়শীল হয়েছেন যে, মিথ্যে কথা বলে নগণ্য কতগুলো লোককে দলে ভেড়াবার কথা তাঁরা কেন ভাববেন ? তাঁরা কি নির্বোধ? যাঁদের জেনেছি, যাঁদের চরিত্র বুঝেছি, দিনের পর দিন যাঁদের সঙ্গ পেয়েছি, যাঁদের কার্যপদ্ধতি দেখেছি, তাঁরা যে একটিও মিথ্যে কথা বলেছেন এ-কথা আমি মনে করিনা। কাজেই যা দেখেছি আর যা শুনেছি, তাই মিলিয়ে সমগ্রভাবে-না-দেখা কৃষকদের সম্বন্ধে কিছু বলতে বসেছি। ধোঁয়া দেখে আগুনের অস্তিত্ব স্বীকার অপ্রকৃত নয়।

একটা দেশের পঁচিশ হাজার মাইল দূরে এলাম, উড়ে নয়, রেলে চড়ে, আর সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎও পেলাম না, এও কি সম্ভব হতে পারে ? পঞ্চাশ কোটি মানুষের প্রতিটি মানুষের পরিচয় কোন পর্যটকই পেতে পারেন না। আমরাও পাইনি। তবে পল্লী আমরাও দেখেছি,

বেশী নয় দু'চারটি। একটির বিবরণ এখানে দিচ্ছি। তা থেকে আধুনিক পল্লী-সংগঠন ও পল্লী-জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে।

যে পল্লীটির কথা বলছি, তা পিকিং শহর থেকে মাইল বিশেক দূরে। কিন্তু তা শহরতলী আদৌ নয়, রীতিমত পল্লী। সারাটা দিন আমরা সেই পল্লীতেই কাটিয়েছিলাম। দুপুরে খেয়েছিলামও সেইখানে। চারশ একত্রিশটি পরিবার নিয়ে এই পল্লীটি গঠিত। পল্লীর মোড়ল, কো-অপারেটিভের কর্মকর্তা, মিউচুয়াল এড টীমের কর্মকর্তা, উইমেন্স ফেডারেশনের নায়িকা এবং শিক্ষকদের একজন প্রতিনিধি প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে আমাদেরকে তাঁদের পল্লীর বিবরণ শোনান; তাঁদের নোটবই দেখে দেখে গত বছর থেকে কোন্ কোন্ বিষয়ে এবছর কি কি উন্নতি হয়েছে, তাই বুঝিয়ে দেন। ফসল কি অনুপাতে বেড়েছে, কো-অপারেটিভের অবস্থা তুলনায় কতটা উন্নত হয়েছে, জিনিসপত্তরের কাটতি কত বেড়েছে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কী পরিমাণে বেড়েছে, স্কুল-বাড়ি কী রকম বাড়াতে হয়েছে, মেয়েদের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে, সবই এক-একজন করে আমাদের শোনালেন, আমাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমাদের অনেক সংশয় ঘুচিয়ে দিলেন। চারটি পুরুষ এবং একটি নারী আড়াই ঘণ্টা সময় নিলেন তাঁদের অগ্রগতি বোঝাতে। এখন, পল্লীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানগুলির নাম এবং বিবরণ দেবার ধারাটাই আগে বিবেচনা করুন। তা হলেই কিছু অনুমান করতে পারবেন পল্লীজীবন কোন্ দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভূমিহীন প্রত্যেক কৃষককে মাথা-পিছু ততো জমি দেওয়া হয়েছে যাতে তার এবং তার পরিবারের প্রত্যেক লোকের অন্নসংস্থানের প্রয়োজনীয় ফসল উৎপন্ন হয়েও কিছু বাড়তি থাকে। খাজনা হিসেবে গভর্নমেণ্টকে অর্থ দিতে হয় না, উৎপন্ন ফসলের ভাগ দিতে হয়। বাকিটা কৃষকেরই থাকে। পরিবারের খাদ্য-চাহিদা মেটাবার মতো শস্য রেখে উদ্বৃত্ত

শস্য কো-অপারেটিভের সাহায্যে বেচবার ব্যবস্থা করা হয়, আবার সমস্ত উৎপন্ন শস্য কো-অপারেটিভে জমা দিয়েও প্রয়োজন মত সেখান থেকে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। যাঁরা এইধরনে কাজ করেন তাঁদেরকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হয়। কো-অপারেটিভের সদস্য যাঁরা, তাঁদের দেয় মূলধন হচ্ছে তাঁদের জমি। তার মানে সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের জমির মালিক হয়েও কো-অপারেটিভের কাছে ব্যক্তি-স্বত্ব ন্যস্ত করেছেন। চীনের সমস্ত কৃষক তো নয়ই, অধিকাংশ কৃষক এখনও কো-অপারেটিভ মারফত কাজ শুরু করেন নি; তবে কো-অপারেটিভ প্রায় সর্বত্র গঠিত হয়েছে এবং কাজও চলছে। জমি পুনর্বণ্টন করেই চীন সরকার জাতির ওপর জোর করে কোন পদ্ধতি চাপিয়ে দেন নি। শুধু কৃষকদের সামনে আদর্শ তুলে ধরেছেন। সেই আদর্শ অনুযায়ী কাজ করবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি এবং সরকার কৃষকদেরকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করছেন। আদর্শের যতখানি জাতি সহজভাবে, স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে আদর্শকে অটুট রেখে ততখানি কাজই করতে দিচ্ছেন। পুরো সমাজতন্ত্র চীনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি; তবে জাতির অগ্রগতি জাতিকে ক্রমশই সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কেবল জমিদারদের খাস জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন কৃষকদেরকে জমি দেওয়া হয়েছে। সম্পন্ন কৃষকদের জমিতে হস্তক্ষেপ করা হয়নি।

নিজের জমিতে নিজের ফসল বাড়াবার ইচ্ছা কৃষিজীবী লোকের স্বাভাবিক ইচ্ছা। কিন্তু ইচ্ছে করলেই ফসল বাড়ানো যায় না, বাধা-বিঘ্ন অনেক আসে। এমন দৈব দুর্বিপাক, কি কৃষকের এমন ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, যার ফলে কৃষকরা বিব্রত হয়ে পড়ে। তখন প্রয়োজন হয় সমবেত প্রয়াস। এই সমবেত প্রয়াস যেমন কো-অপারেটিভ, তেমন মিউচুয়াল এড টীম। কো-অপারেটিভে ব্যক্তি-স্বার্থ

গোষ্ঠী-স্বার্থে মিলিয়ে দিতে হয় বলে সকল কৃষক এখনো সেই দিকে ঝুঁকে পড়েনি, কিন্তু জাপানী যুদ্ধের সময় থেকে অনেকে সমবেত প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছে। কয়েকটি পরিবার একসঙ্গে মিলে চাষের যন্ত্রপাতি খরিদ করে, লাঙল টানবার পশু পালন করে, জলসেচের ঘটি-যন্ত্র তৈরি করে, শস্যের বীজ সংরক্ষণ করে এবং একসঙ্গে সকলে মিলে-মিশে চাষ করে, ফসল বোনে, জল সিঞ্চন করে, জমির আগাছা নষ্ট করে, ফসল কাটে—কিন্তু ফসল ঘরে তোলবার সময়, যার জমিতে যত ফসল হয় তার ঘরে তাই তুলে দেয়। এ হচ্ছে একরকম মিউচ্যুয়াল এড টীম।

আর একরকম মিউচুয়াল এড এর চেয়ে একটু পৃথক ধরনের। তারা সমাজতন্ত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করে। কাজকে তারা বৈজ্ঞানিক ধারায় চালিয়ে নিয়ে যায়। আগে থেকে গোটা বছরের কাজের প্ল্যান করে নেয়। হিসেবপত্র ঠিক করে রাখে। কে কতটা পরিশ্রম করে তার হিসেব রাখে, সেই হিসেব অনুসারে পারিশ্রমিক স্থির করে। যারা কম কাজ করে, তারা জমির মালিক বলেই কম পরিশ্রম ক'রে উৎপন্ন সব ফসল দাবি করতে পারে না। এর জন্য বৈঠক বসাতে হয়, নিয়মিত আলোচনা করতে হয়, আয়ব্যয়ের হিসেব পরিষ্কার করে বোঝাতে হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হদিশ স্থির করতে হয়। এইসব টীমের চেয়ারম্যান থাকে, ভাইস চেয়ারম্যান থাকে, হিসাব-রক্ষক থাকে, কোষাধ্যক্ষ থাকে, প্ল্যানিং অফিসার থাকে এবং সাতজন করে কাউন্সিলর থাকে এবং কাউন্সিলের অর্ধসংখ্যক সদস্য থাকে নারী। এইসব টীমই কাজ করতে করতে ক্রমে কো-অপারেটিভে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এইসব টীমের সাফল্য নির্ভর করে তাদের গণতান্ত্রিক সংগঠনের এবং সিদ্ধান্তের ওপর। টীমের সবাই যদি সমানে লাভবান হয়, পরিচালনায় যদি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ না পায়, তাহলেই এইসব

টীম স্থায়ী হয়, শক্তিশালী হয়। স্থায়ী এবং প্রগতিশীল টীমগুলি তখন সরকারী ব্যাঙ্কের সাহায্য পায়, সরকারী কৃষি বিভাগের সাহায্য পায়, এবং শস্য বিক্রয়ের জন্য মার্কেটিং কো-অপারেটিভেরও সাহায্য পায়।

যে পল্লীর বিবরণ নিয়ে চীনের কৃষিজীবন বোঝাতে চাইছি, সে পল্লীতে এই উন্নত ধরনের টীম আমরা দেখিনি। ওর পুরো বিবরণ পেয়েছি প্রখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর চেন হ্যান-সেঙ লিখিত একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'চায়না রিকন্‌স্ট্রাক্টস' নামক পত্রে। লেখক ওই কাগজের একজন সম্পাদক, সিনো-ইণ্ডিয়া ফ্রেণ্ডশিপ এসোসিয়েশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, চীনের একজন সর্বজনমান্য ব্যক্তি, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, দু'বছর ভারতে থেকে ভারত-চীন সম্পর্ক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা করেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানতে পারি উত্তর-পশ্চিম চীনের পাঁচটি প্রদেশে ছয়লক্ষ বিশহাজার মিউচুয়াল এড টীম পল্লীতে পল্লীতে কাজ করছে আর তাদের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ষাট লক্ষ। শতকরা আঠারোটি মাত্র টীম যে স্থায়ী অর্থাৎ পুরো বছর কাজ করে তাও তিনি বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন এই টীমের কাজের ফলে কোথায় কোন্‌ ফসল কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন হুনান প্রদেশের হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত প্রয়াসের চেয়ে টীমের প্রয়াসে চাল একর-প্রতি শতকরা কুড়ি থেকে বাইশ ভাগ বেশি উৎপন্ন হচ্ছে, তূলো ব্যক্তিগত প্রয়াসের চেয়ে টীমের প্রয়াসে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশি উৎপন্ন হচ্ছে। শান্সি প্রদেশে গম টীমের প্রয়াসে শতকরা আঠারো থেকে কুড়ি ভাগ বেশী উৎপন্ন হচ্ছে, শেন্সি প্রদেশে হচ্ছে শতকরা ত্রিশ ভাগ বেশি, স্যানটাঙ প্রদেশে শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ বেশি আর ওই প্রদেশেরই ওয়েনটাঙ অঞ্চলে শতকরা ৮৬ ভাগ বেশি। ছয়লক্ষ বিশহাজার টীমের সবগুলি স্থায়ী না হলেও সবগুলিই ফসল বৃদ্ধির সহায়তা করছে। আমি যে পল্লীর কথা বলছি, তার

মোড়লও আমাদের যে হিসেব দিয়েছিলেন, তাতেও ফসল বৃদ্ধির হিসেব দেওয়া হয়েছিল।

চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ফসল উৎপাদন যেন কিছুতেই হ্রাস না পায়, স্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলে। তাই ভূমিসংস্কার করেও চীন কৃষকদের ওপর এ চাপ দিচ্ছে না যে, এইভাবেই তোমাকে কৃষি করতে হবে। জোর করে কো-অপারেটিভ বা কলেক্‌টিভ ফার্ম সে চাপাতে চায় না। তাড়াতাড়ি কলের চাষও প্রবর্তন করতে চীন নারাজ। অবশ্য সরকারের প্রয়াসে কতকগুলি স্টেট-ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজও ক্রমশই ভালো হচ্ছে। তবু সরকার সমগ্র কৃষিকে যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেননি। ম্যান-পাওয়ার সম্বন্ধে তাঁরা যতটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, মেশিন সম্পর্কে ততটা নিশ্চিন্ত তাঁরা এখনো হতে পারছেন না, মেশিন তাঁদেরকে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় বলে। তাছাড়া হাজার হাজার বছরের কৃষি-ব্যবস্থা পাল্টে দেবার চেষ্টায় যে সাময়িক বিপর্যয় ঘটতে পারে, তাকে ডেকে আনবার মতো ভরসা হয়তো তাঁরা পাচ্ছেন না, কারণও হয়তো প্রবলতম কিছু দাঁড়িয়েছে বলে মনে করেন না। তবুও সরকারী ফার্ম ধীরে ধীরে বাড়ানো হচ্ছে—যেখানে যন্ত্রের সহায়তায় চাষ করা হচ্ছে, ফসল কাটা ও তোলা হচ্ছে। লিবারেশনের তিন বছরের মধ্যে ৫২টি বড় ধরনের স্টেট-ফার্ম গড়া হয়েছে। এদের কোনটা ১,০০০ একর জমি নিয়ে কাজ করছে, কোনটা বা ৩৩,০০০ একর জমি নিয়ে চাষ করছে। স্টেট-ফার্মের কাছাকাছি অঞ্চলের কৃষকরা স্টেট-ফার্মের কাজ আগ্রহ সহকারে দেখাশোনা করছে। স্টেট-ফার্ম থেকে বিশেষজ্ঞরা গ্রামে গিয়ে কৃষকদেরকে কৃষি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে থাকেন। কোথাও কোথাও গ্রাম্য কৃষকরা দলবদ্ধ হয়ে স্টেট-ফার্মে গিয়ে তাদেরকে অনুরোধ করছে ট্রাক্টর দিয়ে তাদের জমি চষে দিয়ে আসতে। স্টেট-

ফার্ম সে অনুরোধ উপেক্ষা করেন না। কৃষকদের আগ্রহে এবং স্টেট ফার্মের সহায়তায় কোন কোন পল্লীতে কলেক্‌টিভ ফার্ম গড়ে উঠেছে। এরকম দু'টি কলেক্‌টিভ ফার্মের বিবরণ আমরা পড়েছি। একটির নাম 'স্ফুলিঙ্গ', আর একটির নাম 'নবজন্ম'। দুটিই সার্থক সৃষ্টি হয়েছে। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে কৃষিকে ওই পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া। সেই লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়তা নিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু গতি তার অত্যন্ত সাবধান।

কৃষকদের ফসল বৃদ্ধির সুযোগ করে দেবার ব্যবস্থা যেমন প্রথমত মিউচুয়াল এড টীম করে দেয়, তেমন মামলা-মোকদ্দমার জন্য কৃষকদের অর্থব্যয় করতে হয় না। চীনে এখন আর পেশাদার উকিল নেই। জমি-সংক্রান্ত ফৌজদারী দেওয়ানী মামলা নেই। জমি জোর-দখল করবার উপায় নেই, কেননা কার কতখানি জমি তার হিসেব সরকারী দপ্তরে যেমন আছে, তেমন গ্রামের মোড়লের, কৃষক কমিটির মিউচুয়াল এড টীমের জানা আছে। তাঁরাই মামলার কারণ ঘটতে দেয় না। মামলার জন্য আমাদের দেশেও কৃষকদের আয়ের কী পরিমাণ ব্যয় করতে হয়, তা আমাদের জানা আছে। চীনের আজকার কৃষকদের তা করতে হয় না। ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয় না, গাঁয়ের স্কুলেও না, বিশ্ববিদ্যালয়েও না। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস ডিরেক্টর আমাদের শুনিয়েছেন বর্তমানে সে-বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট চার হাজার চারশত ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে তিন হাজার আশিজন এসেছে কৃষক ও শ্রমিক পরিবার থেকে। প্রবীণ সেই পণ্ডিতের কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ খুঁজে পাই না। তিনি নিজে কুড়িজন অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে তিনঘণ্টা কাল ঘুরে ঘুরে আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়টির সকল বিভাগ দেখিয়েছিলেন। তিনজিন পলিটেক্‌নিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা তিনহাজার।

তার মাঝে ছাত্রীর সংখ্যা ছয়শো। এখানে সাতটি টেকনিকাল বিষয় শিক্ষা দিয়ে সংগঠন-কাজের ছাত্র সরবরাহ করা হয়। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস ডিরেক্টার শোনালেন কৃষক-শ্রমিকদের পরিবার থেকে এত বেশি ছাত্র-ছাত্রী আসছে যে, আগামী সেশনে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা দ্বিগুণ অর্থাৎ ছয় হাজার হবে। দেখলাম, সেই অতিরিক্ত তিনহাজার ছাত্র-ছাত্রীর ডরমিটারি তৈরির কাজ দিবা-রাত্র চলছে। আমরা যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখতে গিয়েছিলাম, তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টিতেও কাজ চলছে, ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করছে। সেশনের আগে ডরমিটারি শেষ করতে হবে বলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী গ্রীষ্মাবকাশ নেননি। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি লিবারেশনের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষক ও শ্রমিক পরিবারের ছাত্র-ছাত্রী বেড়ে যাচ্ছে শুনে আমাদের বিস্ময়ের অবধি নেই। কিন্তু চীনের আধুনিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠনে সেইটেই তো স্বাভাবিক প্রগতি।

কৃষকদের খাবার পরবার চিন্তা দূর করা হয়েছে বলে ছেলে-মেয়েদের তারা ক্ষেতের কাজে আবদ্ধ রাখে না। পড়াতে পয়সা খরচ হয়না বলে তারা ছেলেমেয়েদের পড়ার এবং স্কুল-কলেজ থেকে বেরুলেই কাজ পাওয়া যায় বলে ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে পাঠায় পরিণামে সংসারের সুরাহা হবে বলে। কৃষকদের ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় পল্লী-সংস্রব একেবারে বর্জন করেনা বলে তাদের সংস্পর্শে প্রতি কৃষক পরিবারে নতুন জীবনের আদর্শ প্রসার লাভ করে। যে-সব কৃষক এখনও নিরক্ষর তারাও ছেলে-মেয়েদের মারফত নতুন করে শিক্ষালাভ করে। অবশ্য বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থাও পল্লীতে-ফ্যাক্টরিতে সমানে করা হচ্ছে।

চীনের সামাজিক জীবনের বড় পরিবর্তন হচ্ছে নতুন বিবাহ আইন। পাত্র-পাত্রীর মতামত, পূর্বরাগ, অনুরাগ, উপেক্ষা করে বিয়ে দেওয়া হোতো বলে লিবারেশনের আগেকার চীনা নর নারীকে অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হোতো। নারীর ওপরই জুলুম জবরদস্তি চলত বেশি। সামাজিক দুর্নীতিও তার ফলে অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। লিবারেশনের পর নর-নারীর সম-অধিকার সর্বত্র স্থাপিত হবার ফলে এবং নতুন বিবাহ-আইন চালু হবার ফলে নারীর ওপর জুলুম যেমন বন্ধ হয়েছে, তেমন সামাজিক দুর্নীতিও দূর হয়েছে। আগে জমিদাররা অথবা ধনিকরা ইচ্ছে করলেই যে-কোন দুঃস্থ পরিবারের কন্যাকে বা যে-কোন সম্পন্ন পরিবারের পরিচারিকাকে রক্ষিতারূপে রাখতে পারত। তাদের মেয়েরা এবং জবরদস্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত বিবাহের ফলে অসন্তুষ্টা ও উপদ্রুতা বধূরা সুযোগ পেলেই সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করত। জমিদাররা ধনিকরা এবং বিদেশী বণিকরা নিছক ভোগের জন্য পতিতাবৃত্তিকে উৎসাহ দিত। আজ সে-সব বন্ধ হয়েছে। নয়া চীনে পতিতা নেই। তাদেরকে কাজ দিয়ে, মর্যাদা দিয়ে, সমাজের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে। চীনা নারীর সব চেয়ে অসম্মান অন্নের জন্য যাকে-তাকে দেহদান করবার গ্লানি থেকে জাতির বহু নারীকে বাঁচিয়েছে, জাতির অবলুণ্ঠিত মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

নতুন বিবাহ আইন প্রাপ্ত-বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। ওরা যদি বিয়ে করতে চায়, ওদের অভিভাবকরা বা সমাজপতিরা সে বিয়েতে বাধা দিতে পারেনা। বাধা দেবার চেষ্টা হবে বে-আইনি কাজ। ডিভোর্স ছাড়া কোন বিবাহিত নর বা বিবাহিতা নারী একাধিক বিবাহ করতে পারবেনা। স্বামী আর স্ত্রী সামাজিক ও অর্থনীতিক সকল বিষয়ে সম-অধিকার

সম্পন্ন হবেন। পরকীয় এবং পরকীয়া-প্রীতি ডির্ভোসের দাবির সহায়ক হবে। সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেয় অর্থ স্বামীকে স্ত্রীর হাতে নিয়মিতভাবে তুলে দিতে হবে। না দেওয়া অবৈধ বিবেচিত হবে এবং স্ত্রী তার জন্য পিপল্‌স্‌ কোর্টে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করতে পারবেন। অবশ্য হামেশাই তা করতে হয়না, কেননা প্রতি পল্লীতে, ফ্যাক্টরিতে বা বসতিতে, নারী এবং পুরুষ ফেডারেশনের কর্মীরা থাকেন। তাঁরাই ও-সম্বন্ধে তদারক করে প্রয়োজন মতো স্বামী বা স্ত্রীকে সংশোধন করেন। তাঁরা যখন কোন সুব্যবস্থা করতে পারেন না, তখনই কেবল পিপল্‌স্‌ কোর্টে মামলা ওঠে। কোন রকম মামলা তুলতেই বিচারপ্রার্থিদেরকে কোর্ট-ফী, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি দিয়ে আর্জি করতে হয়না। উকিল নিয়োগ করতে হয়না। বাদী ও প্রতিবাদীপক্ষের অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট আইন বিশ্লেষণ দ্বারা মামলার কারণ বুঝিয়ে দেবার জন্য সরকারের নিযুক্ত দুজন আইনজ্ঞ থাকেন। তাঁরা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইনকে ব্যাখ্যা করে মামলা-বিশেষ কোন্‌ সামাজিক দুষ্ট-ক্ষতের পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, কোর্টকে তাই বুঝিয়ে দেন। কোর্ট গঠিত হয় জজ ছাড়া পুরুষ এবং নারী ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে। সাক্ষীদের মাঝে যেমন থাকে বাদী প্রতিবাদীর প্রতিবেশীরা, তেমন থাকে আঞ্চলিক সামাজিক কর্মীদের প্রতিনিধিরা। জজ শুধু মামলারই বিচার করেন না, অর্থাৎ অপরাধের জন্য শাস্তি বা অপরাধ প্রমাণিত না হলে অব্যাহতি দেন না। আইনের মর্যাদা বিচারই তাঁর সব চেয়ে বড় কর্তব্য নয়, বড় কর্তব্য হচ্ছে আইন যে-উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে, সমাজ-ব্যবস্থা সেই অনুসারে চলছে কিনা তাও বিচার করে দেখা। শাস্তি বা অব্যাহতি দেওয়াই তাঁর একমাত্র কাজ নয়। তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে অপরাধ-প্রবণতার সংশোধন। শুধু বাদী-

প্রতিবাদীর কাজই তিনি বিচার করে দেখেন না, আঞ্চলিক সমাজ-কর্মীদের কাজও ওই প্রসঙ্গে তিনি বিচার করে দেখেন। তিনি বিচার দ্বারা বুঝতে চান সমাজকর্মিরা সামাজিক মানুষকে নতুন জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করতে কতটা সফল হয়েছে বা কতটা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ত্রুটি থাকলে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করেন এবং সমাজ-কর্মীদের প্রতি নির্দেশ দেন তাদেরকে কি ভাবে কাজ করে সমাজের মানুষকে অপরাধ-প্রণবতার উর্ধ্বে তুলতে হবে। শাস্তি কেবল তখনই দেওয়া হয়, যখন বোঝা যায় কিছুদিনের জন্য অপরাধীকে একটা শৃঙ্খলাপূর্ণ আবহাওয়ায় নিয়মিত কর্ম-ব্যস্ততায় নিযুক্ত রাখা প্রয়োজন। কেবল তখনই অপরাধীকে জেলে পাঠানো হয়। জেলের শৃঙ্খলা আর কর্ম-প্রবণতা অনেকেরই মনে পরিবর্তন এনে দেয়। যাদের তা আনে, তারা কাজে মেতে ওঠে, কাজে দক্ষতা অর্জন করে। কোন অপরাধী যখনই জেলে দক্ষতার পরিচয় দেয়, তখনই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেই কাজের কোন ফ্যাক্টরিতে যে-কাজে সে দক্ষতা অর্জন করেছে। সেখানে অপরাধী হয়ে ওঠে রোজগেরে মেহনতী মানুষ, সেখানে সে-পায় শ্রমিকের মর্যাদা। সেখানেও যদি সে কাজে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে, নিপুণতার পরিচয় দিয়ে, উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করতে পারে, তাহলে সে আদর্শ শ্রমিকের সম্মান পায়। সে তখন ইচ্ছে করলে পুরো-মাইনেয় তিনমাস করে ছুটি নিয়ে বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা খরচায় শিক্ষা নিয়ে আসতে পারে। সেই শিক্ষা নেবার জন্য তাকে ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে হবেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের জন্য সার্টিফিকেট চাই তরুণ-তরুণী শিক্ষানবীশদের জন্য যারা যোগ্যতার পরিচয় দেবার আর কোন সুযোগ পায়নি। কিন্তু সে তো যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে; জেলে থাকতে সে পরিচয় দিয়েছে, ফ্যাক্টরিতে এসে

সে পরিচয় দিয়েছে। ফ্যাক্টরি ডিরেক্টরের সার্টিফিকেট, জেল ডিরেক্টরের সার্টিফিকেট, তার ট্রেড ইউনিয়নের সার্টিফিকেট, তার কাজের সার্টিফিকেট, স্কুল-ফাইন্যাল সার্টিফিকেটের চেয়ে অনেক বড়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা তার মতো কর্মীকে লুফে নেবেন এই জন্য যে, দেশময় যে সংগঠন চলছে, তাকে সফল করে তোলবার জন্য উপযুক্ত কর্মী সরবরাহ করবার তাগিদ প্রতিনিয়তই তাঁদের কাছে আসছে। দাম্পত্য জীবনের গরমিলজাত মামলার কথা বলতে গিয়ে বক্তব্য থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছি। তাই নতুন-বিবাহ আইনের কথায় আবার ফিরে আসা যাক।

নতুন বিবাহ আইনে শুধু প্রাপ্ত-বয়স্ক বর-কনের সম্মতিই যথেষ্ট নয়, ডাক্তারি সার্টিফিকেট সবচেয়ে আগে দরকার। ডাক্তারি সার্টিফিকেট ছাড়া কোন মতেই বিয়ে হতে পারবে না। ডাক্তারি পরীক্ষায় যদি ধরা পড়ে বর বা কনের কোন দুষ্ট ব্যাধি আছে, তাহলে ব্যাধিগ্রস্ত পাত্র বা পাত্রীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। চিকিৎসার ফলে যতদিন না পাত্র বা পাত্রী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত বলে বিঘোষিত হবে, ততদিন তারা বিবাহের লাইসেন্স পাবেনা। সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হলেই পাবে। এর ফলে বিবাহ আইন প্রবর্তিত হবার পর চীনদেশে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করছে, তারা আগেকার তুলনায় অনেক বেশি সবল হচ্ছে, ওজনে ভারি হচ্ছে। যে গ্রাম নিয়ে আলোচনা করছি, সেই গ্রামের নারী ফেডারেশন অধিনায়িকা প্রবীণা নারী। তিনি আমাদের শোনালেন, গ্রামের শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। শিক্ষিতা ধাই গ্রামে এর মাঝেই প্রয়োজন মতো পাওয়া যাচ্ছে। নারী ফেডারেশন গর্ভিণীদের তদারক করেন এবং কোন গর্ভিণী সম্বন্ধে জটিলতার লক্ষণ প্রকাশ পেলেই গর্ভিণীকে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিভিন্ন ইউনিয়নের

বিভিন্ন হাসপাতাল আছে। সেই সব হাসপাতালে শ্রমিকদেরই কেবল চিকিৎসা হয়না, শ্রমিকের পরিবারের লোকদেরও চিকিৎসা হয়। পঞ্চাশ কোটি নর-নারীর দেশে যত হাসপাতাল দরকার, তত হাসপাতাল নিশ্চিতই এখনো গড়ে ওঠেনি কিন্তু গড়ার কাজ দ্রুত চলছে। হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সারি গড়ে তোলা ট্রেড ইউনিয়নের বড় কাজ ; সরকারের তো বটেই। বেশি লোক রুগ্ন থাকলে, শারীরিক অক্ষমতার জন্য বেশি লোক অক্ষম থাকলে, সংগঠন বিলম্বিত হবে— সর্বপ্রকার সংগঠন। তাই সর্বস্তরের লোককে, সকল কর্মীকে, সুস্থ সবল রাখতে হবে। পল্লীতে, শহরে, ফ্যাক্টরিতে, স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র দেহচর্চার ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সর্বত্র পার্কগুলিকে বড় করা হচ্ছে ; জিমনাসিয়াম, সুইমিংপুল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, মিউজিয়াম বাড়ানো হচ্ছে, পল্লী থেকে কৃষকদেরকে আর ফ্যাক্টরি থেকে শ্রমিকদেরকে নিয়মিত মিউজিয়ামে নিয়ে গিয়ে সব দেখানো হচ্ছে, বোঝানো হচ্ছে। মিউজিয়ামগুলিতে শুধু প্রত্নতত্ত্বেরই পরিচয় দেওয়া হচ্ছেনা, শুধু প্রাচীন এবং আধুনিক শিল্প-সৃষ্টিই সংরক্ষিত হচ্ছেনা, সুস্থ ও সবল জীবন গড়বার জন্য কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার চিত্র দিয়ে, মডেল দিয়ে, কোন কোন মডেল বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কাজ করিয়ে তা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেক মিউজিয়ামের ডিরেক্টরের কাছে শুনেছি সপ্তাহে দশহাজার, পনেরো হাজার দর্শক মিউজিয়াম দেখতে আসে। বেশি মিউজিয়াম পরিচালনা করবার দায়িত্ব রয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মীদের ওপর। ট্রেড ইউনিয়নও ‘সাংস্কৃতিক কাজকর্মের’ জন্য প্রচুর ব্যয় করে থাকেন, চীন সরকারও সবচেয়ে বেশি অর্থব্যয় করেন সংগঠনের জন্য, তারপরই সর্বাধিক ব্যয় হয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতির খাতে।

পল্লীর নারীরাও কৃষিকাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। আগেকার

জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হলেও নাগরিক হিসেবে প্রাপ্য জমি তাঁরাও পেয়েছেন। তাঁদের আগেকার বাড়িতে তাঁদের পরিবারের লোকের জন্য সাধারণ-মান হিসেবে যত ঘরের দরকার, তা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত ঘরগুলি অন্য কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য গ্রামে আমরা যেমন পুরুষানুক্রমিক কৃষকদের বাড়ি দেখতে গিয়েছি, তেমন আগে যাঁরা ওই গ্রামেই জমিদার ছিলেন, এখন কৃষিজীবী হয়েছেন, তাঁদেরও বাড়িতে গিয়েছি। প্রাক্তন জমিদার গ্রামে নতুন জীবনের সঙ্গে বনিয়ে চলছেন। পুরুষানুক্রমিক কৃষকরা আদর করে তাদের পরিচ্ছন্ন ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসিয়েছেন. চা খাইয়েছেন, বোর্ডও আছে তাও দেখিয়েছেন, আবার কী ফসল ঘরে তুলেছেন, তাও দেখিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের পরিবর্তনের বিবরণ বলতে বলতে কৃতজ্ঞতাভরা চোখ দুটি দিয়ে চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন। ও-ছবি চীনের সর্বত্র।

নারী কর্মীরাও ক্ষেতে কাজ করে আদর্শ শ্রমিকের মর্যাদা পেতে পারেন। আমি যে গ্রামের কথা বলছি, সে গ্রামে নারী আদর্শ শ্রমিক কেউ আছেন বলে শুনতে পেলামনা। তবে অভিজ্ঞের মুখে শুনেছি; কাগজেও পড়েছি, ক্ষেতের কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েও অনেক নারী আদর্শ শ্রমিক হয়েছেন। পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত ‘সারা চীন নারী কংগ্রেসে’ সমবেত ৮৯৪ জন নারী কর্মীর মাঝে যে পাঁচটি নারী কাজে কৃতিত্বের পরিচয় দেবার জন্য সকলের সুখ্যাতি পেয়েছেন, তাঁদের মাঝে তিনজনা কৃষকের ঘরের মেয়ে। বিশ বৎসর বয়স্কা চ্যাঙ-সুই-জাঙ চীনের শ্রেষ্ঠতম ট্রাক্টর ড্রাইভারদের একজন। মিআও জাতীয়া তেত্রিশ বছর বয়স্কা সিয়াং পি-ইং কুইচৌ প্রদেশের একটি স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানের সহযোগী অধ্যক্ষা হয়েছেন। আর চব্বিশ বছর বয়স্কা সেন চি-ল্যান শান্সি প্রদেশের একটি মডেল

এগ্রিকালচারাল ফার্মের ডেপুটি-প্রধান হয়েছেন। এঁদের সকলের বিবরণ 'চায়না রিকনস্ট্রাক্টস' নামক কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। যে পল্লীকে উপলক্ষ করে আমি চীনের কৃষকদের অবস্থা বোঝাতে চাইছি, সে পল্লীতে উপরোক্ত ধরনের নারীকর্মীর অস্তিত্বের কোন পরিচয় পাইনি। তবে নারী ফেডারেশনের যে নেত্রী আমাদেরকে সেই পল্লীর কৃষক-রমণীদের বর্তমান অবস্থা বোঝাচ্ছিলেন, তিনি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের শুনিয়েছিলেন কৃষিকাজে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ক'টি কৃষকরমণী কি রকম দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। চীনে বর্তমানে দুইলক্ষ তেইশ হাজার আদর্শ শ্রমিক আছেন। তার মাঝে কতজনা কৃষক, কতজনা শ্রমিক, তার পৃথক হিসেব আমার চোখে পড়েনি। তবে পাঁচটি শ্রেষ্ঠা নারীকর্মীর মাঝে তিনটিই যখন কৃষক পরিবার-জাত, তখন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, দুইলক্ষ তেইশ জন আদর্শ কর্মীর মাঝে হাজার হাজার কৃষক ও কৃষক রমণী আছেন। তার মানে কৃষক সমাজের বহু নর-নারী দক্ষতার পরিচয় দিয়ে উর্ধ্বতর স্তরে উঠে গেছেন।

পল্লী-জীবন দুর্বহ হয়ে উঠলে তার পরিচয় শহরে থেকেই পাওয়া যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কোলকাতার ফুটপাথে যে কঙ্কালসার নর-নারী মারা গিয়েছিল, তারা এসেছিল পল্লী থেকেই। এখনও ভিক্ষার জন্য যারা রাস্তায়, গলিতে, গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে, খাবার দোকানের সামনে কাতর প্রার্থনা জানায়, তারাও আসে পল্লী থেকে। কোলকাতা থেকে দিল্লী বা বোম্বাই যাবার সময় স্টেশনে স্টেশনে যে ভিক্ষুকদের আবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়, তারাও একদিন পল্লীরই অধিবাসী ছিল, হয়ত কৃষিজীবীই ছিল। ওদের দেখে পল্লীর অবস্থা বোঝা যায়। চীনের কোন বড় শহরে তো নয়ই, দিনের পর দিন যে রেলপথে ঘুরেছি, তার কোন স্টেশনেও ভিক্ষুক দেখিনি। ফুটপাথে

কাউকে শুয়ে থাকতে দেখিনি যদিচ প্রত্যহ রাত সাড়ে-এগারো-বারোটায় শহরের নানা রাস্তা বয়ে আমরা হোটেলে ফিরতাম। খুব লক্ষ্য করেও উল্লেখযোগ্য ছেঁড়া কাপড় পরা লোক দেখিনি, ব্যাধিগ্রস্তকে পথ চলতে দেখিনি। পক্ষান্তরে দোকানে, বাজারে বেচা-কেনার বহর দেখে বিস্মিত হয়েছি। পিকিং শহরের ওয়াং ফু চিং রাস্তায় দোকানে দোকানে ক্রেতার ভিড়। গভর্নমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট স্টোরে দৈনিক বাইশ হাজার ক্রেতা সমবেত হয়। রবিবারে হয় তারও দ্বিগুণ। আধা সরকারী এবং বেসরকারী স্টোরগুলিতেও প্রায় ওই রকমই ক্রেতার ভিড়। তিনজিনে, সাংহাইতে ছয়তলা, সাত-তলা, ডিপার্টমেণ্ট স্টোরগুলিতে ক্রেতাদের কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে জিনিস কিনতে দেখেছি। ক্রেতারা কারা? শহরে জমিদার নেই, জোতদার নেই, দালাল নেই, উকিল-ব্যারিস্টার নেই, হাকিম নেই, মোটা মাইনের সিভিল সার্বিস নেই, বেশি ফি-ওয়ালা ডাক্তার নেই। সাধারণ মানুষ অত জিনিস কেনে কি করে, আর অত ক্রেতাই বা আসে কোন্ শ্রেণী থেকে? শ্রেণী তো মাত্র একটি, অর্থাৎ শ্রমিক। কৃষকও তাই, কারখানার কর্মীও তাই, হাসপাতালের ডাক্তাররাও তাই, লেখকও তাই, অভিনেতাও তাই, অভিনেত্রীও তাই, নাচিয়েও তাই, গাইয়েও তাই, চিত্রীও তাই। এরাই কেনে। এদের মাঝে কৃষকদেরও সংখ্যা নিশ্চিতই নগণ্য নয়।

নাটক ও অভিনয়

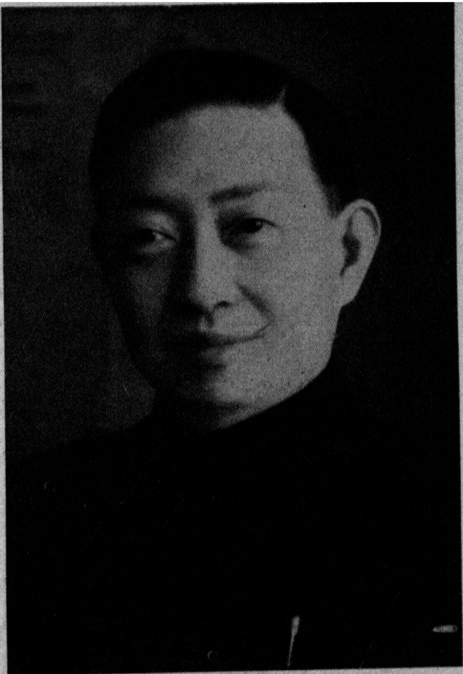
নয়া চীনের নূতন নাটক দেখবার স্থযোগ আমরা পাইনি, এ-কথা অন্যত্র বলেছি। পিকিং অপেরা শ্রেণীর নাটক দেখেছি, আর ওঁরা যাকে 'লোকো-অপেরা' বলেন তাও দেখেছি। পিকিংয়ে দুই-ই দেখেছি। অপেরা বলতে আমরা যা বুঝি, পিকিং অপেরা শ্রেণীর নাটক কিন্তু ঠিক তা নয়। আমাদের পালা গীতাভিনয়ের (যাত্রা-গানের) সঙ্গে মিল অনেক বেশি, আঙ্গিকেও অনেক সাদৃশ্য আছে। আমাদের মঞ্চগুলিতে অভিনীত পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল থাকলেও তার অভিনয়ে কনভেনশনের ওপর জোর দেওয়া হয়না বলেই পিকিং অপেরা জাতীয় অভিনয়ের সম-পর্যায়ে ফেলা যায়না। পিকিং অপেরায় কনভেনশন এবং মুদ্রার ওপর অনেক বেশি জোর দেওয়া হয়। সে অভিনয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হলে এবং সেই দক্ষতার পরিচয় দিতে হলে অভিনেতাদেরকে দীর্ঘকাল অভিনয়-রীতি শিক্ষা করতে হয়। কেবল সংলাপ আয়ত্ত করে অথবা নিজ-নিজ ব্যক্তিগত প্রয়াস-ভঙ্গির ওপর নির্ভর করে পিকিং-অপেরা অভিনয়ে নাম করা যায়না। এই কারণেই পিকিং অপেরায় যেমন অভিনেতাদের স্বৈরাচার প্রকাশ পায়না, তেমন তা এমেচারিশ উচ্ছৃঙ্খলতায় নিম্নতর স্তরে নেমে অবনত হতেও পারেনা। কনভেনশন আর মুদ্রা আয়ত্ত করতে অভ্যাসকে অব্যাহত রাখতেই হবে। সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ শিল্পী

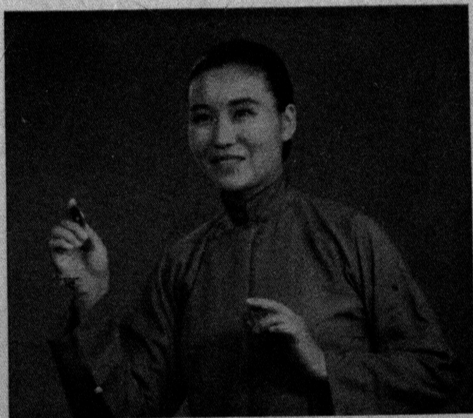
ছাড়া এই বিশেষ ধরনের নাটক কেউ পরিচালনা করতে পারেন না বলেই নাটক ও তার অভিনয় নিম্নগামী হয়না। মাঝে মাঝে প্রতিভাবান পরিচালকরা পরম্পরাক্রমে এর উন্নতিই করে এসেছেন। মি ল্যান-ফ্যাঙকে এই পরিচালকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে সম্মান দেওয়া হয়। তাঁর পিতামহ, পিতা, তিনি নিজে এবং তাঁর পুত্র, এই চার পুরুষ পিকিং-অপেরা-অভিনয়ে বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সকলেই স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করেছেন। পিকিং অপেরায় এখনো পুরুষরাই স্ত্রী ভূমিকা অভিনয় করেন।

কনভেনশন আর মুদ্রা ছাড়া পিকিং অপেরার অভিনেতাদেরকে আর যা অভ্যাস করতে হয়, তা হচ্ছে নাচ, গান এবং বিশেষ বিশেষ অর্থবাহক মুখ-সজ্জা। নাচতে ও গাইতে প্রায় সবাইকেই হয়। কি প্রকার চরিত্রকে রূপায়িত করতে হলে মুখে কোন্ রঙ দিতে হবে, অভিনেতাদের তাও জানতে হবে এবং চিরাচরিত নিয়ম মানতেও হবে। চরিত্রের মূলগত প্রকৃতি অনুসারে মুখের রঙ সাদা, কালো, নীল, সবুজ, বেগুনে, লাল অথবা ওদের সবগুলি বা অনেকগুলি চড়িয়ে অভিনেতাদের স্বাভাবিক রঙ এবং মুখাকৃতি চাপা দিতে হবে। তৈরি মুখোশ, মনে হোলো, ওঁরা বেশি ব্যবহার করেন না। আমাদের কথাকলি-নাচিয়েরা তৈরি মুখোশ ব্যবহার করেন। তাঁরা কি করে সেগুলি তৈরি করেন, তাই জানবার জন্য নানা যায়গায় ওঁদের নানা শিল্পী আমাদের সাজঘরে গিয়ে কৌশলটি দেখবার অনুমতি চাইতেন। পোশাকের রঙও চরিত্রানুযায়ী করতে হবে, পুরুষ চরিত্রের দাড়ি-গোঁফও তাই এবং পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্রের চোখ আর ভ্রূ বিশেষ করে আঁকতে হবে। নেপথ্যের যন্ত্র-সঙ্গীতের ওপরও পিকিং অপেরায় জোর দেওয়া হয়।

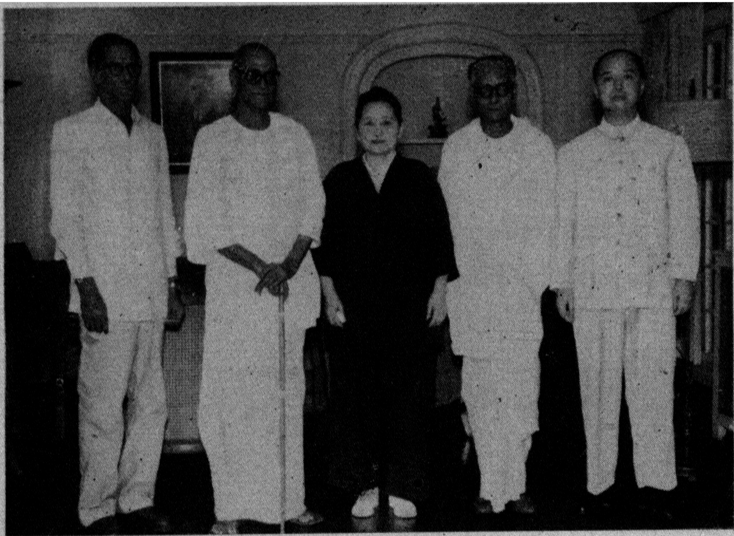
চার রকম চরিত্র পিকিং অপেরায় রাখতেই হবে। তা হচ্ছে

চীনের প্রখ্যাত অভিনেতা
মি ল্যান-ফ্যাঙ

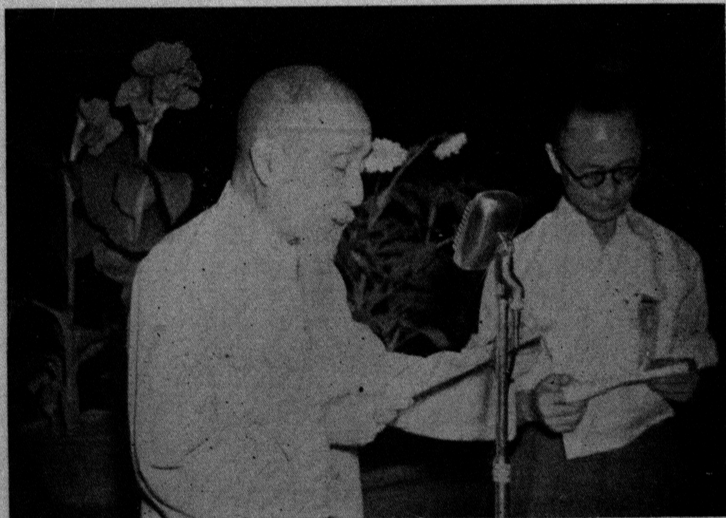




ইয়াও চেন



সুং চিং-লিং (মাদাম সান ইয়াত-সেন) এবং প্রতিনিধিদলের নেতা ও উপনেতা



চীন শান্তি কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান

এই ; (১) সেঙ অর্থাৎ পুরুষ ; (২) তান, স্ত্রী ; (৩) চিন (রঙীন মুখের লোকেরা, অর্থাৎ দেবতারা, রাজ-কর্মচারীরা) আর (৪) চৌ অর্থাৎ বিদূষক অথবা ভঁাড়। স্ত্রী-চরিত্রও আবার তিন শ্রেণীর হতে হবে, যথা : (১) চিঙ-ই, কল্যাণময়ী ; (২) হুয়া-তান, কামিনী অথবা কুটীলা অথবা স্বার্থপরা ; (৩) তাওমা-তান, অর্থাৎ বীরাঙ্গনা। এতদিন চিঙ-ই চরিত্রাভিনেতাদের বিশেষ করে সঙ্গীত-শাস্ত্র চর্চা করতে হোতো, হুয়া-তান চরিত্রাভিনেতাদের ভালো করে শিখতে হোতো বাচনিক ও আঙ্গিক অভিনয়-কৌশল আর তাওমা-তান চরিত্রাভিনেতাদের শিখতে হোতো যুদ্ধকে মঞ্চে প্রতিফলিত করবার কৌশল। অভিনেতারা সবাই এই সব বিদ্যা আয়ত্ত করতেন না। এক-একজনে এক-একটি বিদ্যা আয়ত্ত করতেন। পূর্বে পিকিং অপেরা সেঙ চরিত্র-প্রধান হোতো। কিন্তু মি ল্যান-ফ্যাঙ তান-চরিত্রকেও প্রাধান্য দিয়ে সেঙের সম-পর্যায়ে তুলে দিয়েছেন—সমাজেও যেমন নর-নারীকে আজ সম-অধিকার সম্পন্ন করা হয়েছে।

পিকিং অপেরার পোশাকেও রয়েছে বৈশিষ্ট্য। অভিনয় যেমন বর্ণ-বহুল, পোশাকেও তেমন তাই। চীনের সবচেয়ে মূল্যবান রেশমী কাপড় দিয়ে তা তৈরি হয়। গান যেমন উঁচু-স্বরে বাঁধা, তেমন বাজনা আর কণ্ঠাভিনয়ও উচ্ছল, পোশাকও উজ্জ্বল। পিকিং অপেরা অত্যন্ত জনপ্রিয়। যুগ-যুগান্ত অতিক্রম করেও জনপ্রিয় রয়েছে। আমরা যাবার চার মাস আগে মি ল্যান-ফ্যাঙ একটি দল নিয়ে সাংহাইতে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন। শুনতে পেলাম প্রথম দিনেই ষাট-হাজার লোক টিকিট কেনে, আর তাদের বেশির ভাগই শ্রমিক।

পিকিংয়ে আমরা এই অপেরার এক অভিনয় দেখি। অপেরাটির চৈনিক নাম বলতে পারবনা, ইংরিজি প্রোগ্রামে নাম দেওয়া হয়েছিল—

The Magic Monkey Puts Heaven in Disorder. গল্পটি একটি প্রাচীন লোক-কাহিনী থেকে গৃহীত। তার মর্ম এই :

এক ছিল বানর। তার নাম সান উ-কুঙ। তার প্রকৃতি যেমন উদ্ধত ছিল, তেমন ছিল মধুর। সে ছিল সকল যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ। রণ-কৌশলে সে ছিল স্বর্গের দেবতাদেরও সমকক্ষ। তার আশ্চর্য রণ-নৈপুণ্য ছিল যেন যাদুকরের খেলা। তাই তার পরিচয় ছিল যাদুবিদ্যাবিশারদ বানর। তাকে খুশি রাখবার জন্য দেবতারা তাকে একটি গালভরা উপাধি দিয়ে বোঝাতে চান যে, তাঁরা তাকে রীতিমত সম্মান করেন, কিন্তু কার্যত তাকে পীচ-ফল বাগানের রক্ষক করে রাখেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী সান উ-কুঙ বুঝতে পারে যে দেবতারা উপাধি দিয়ে তাকে সম্মান দেবার ছল করে হীন-কাজ দিয়ে তুষ্ট রাখতে চাইছেন। সে দেবতাদের এই ছলনার প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে যে স্বর্গরাজ্য সে লণ্ড-ভণ্ড করে দেবে।

স্বর্গবাসীদের সকলের মাতৃস্থানীয়ার জন্মোৎসবের দিন। প্রতিশোধ নেবার উপযুক্ত দিন মনে করে সে স্বর্গের সব পীচ-ফল খেয়ে ফেলল, সমগ্র সুরা করল নিঃশেষ। শুধু তাই নয় দেবতারা তাঁদের অনন্ত যৌবন অটুট রাখবার জন্য যে অমৃত বটিকা নিত্য সেবন করতেন তার আধারটি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল ফুল-ফল পর্বতস্থিত তার গুহা-বাসস্থলে। স্বর্গে ফল নেই, সুরা নেই, সর্বোপরি অনন্ত যৌবন অটুট রাখবার অমৃত-বড়ি নেই। স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী মাতৃদেবীর জন্মোৎসব তো পণ্ড হোলই, তারপর দেবতারা সকলেই নিজ-নিজ যৌবন হারাবার ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দেব-সমাজে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। তাঁরা গিয়ে ফুল-ফল পর্বত অবরোধ করলেন, যাদুকর বানরকে তারা শাস্তি দেবেন, অন্তত

যৌবন সংরক্ষণ বড়িগুলো তো নিয়েই আসবেন। যাদুকর বানর তার দলবল নিয়ে প্রলয়-সংগ্রাম শুরু করে দিল। দেবতারা তাকে পরাজিত করতে পারলেন না—নিজেরাই পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

অনন্ত-যৌবন-বটিকা হারাবার ফলে দেবতাদেরকে স্বর্গও হারাতে হলো কিনা, নাটকে তা দেখানো হয়না। যে প্রোগ্রাম আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তাতে নাটকের এই ভাষ্য দেওয়া হয়েছিল—"প্রাচীন চীনের জনগণ এই রকম রূপক অবলম্বন করেই ফিউডাল-শাসনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করত।" নাটকের সংলাপের ভিতরে ও-রূপ কোন কথা আছে কিনা, তাঁ জানবার উপায় আমাদের ছিলনা। যে-হেতু আমরা চীন-ভাষা বুঝি না। সে যাই হোক অপেরাটি আমার কাছে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হোলনা। স্বর্ণ-লঙ্কার অশোক-কাননে আমাদের আরাধ্য মহাবীরাবতার শ্রীহনুমান যে-কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, কৃত্তিবাস কবির কল্যাণে শিশুকাল থেকেই তো তাঁকে আমরা সত্য মনে করে নিতে অভ্যস্ত হয়েছি। আরো একটি কথা এখন আমার মনে পড়ছে। স্বদেশী আমলে আমরাও রামায়ণের নানা কাহিনীকে জাতির মুক্তি-প্রয়াসের পরিচয় বলে প্রচার করবার জন্য রামায়ণী কাহিনীর নতুন ব্যাখ্যা করে তাতে স্বদেশী গান জুড়ে দিয়ে কথকতার পালা রচনা করতাম। তাতেও রাবণকে ইমপীরিয়ালিজম-এর প্রতীক আর বানর-কটককে জনগণ করে বোঝাতাম। তখনকার বিপ্লবী ছাত্রদের বহু সমাবেশে আমাকেও অনেকবার কথকের ভূমিকা অভিনয় করতে হয়েছে। কাজেই চীনের এই গণ-রূপকের যে ভাষ্য প্রোগ্রামে দেওয়া হয়েছিল সব দেশের গণনাট্যেই সে ভাষ্য পাওয়া যায়।

ভাষ্য গ্রহণ করতে আমার যে কুণ্ঠাই থাক, অভিনয়কে অভিনন্দিত করতে কিন্তু কোনই কুণ্ঠা হয়নি। যাদুকর বানরের ভূমিকা যিনি

অভিনয় করেছিলেন, তাঁর নাম ওয়াং মিন-চান। তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য এক আশ্চর্য শক্তির সাহায্যে, তখনকার মতো, এ-কালের আর সে-কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিল; বুদ্ধিবৃত্তিকে সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হতে দিল না। মায়াজাল বুনে দর্শককে এইভাবে সাময়িকভাবে মোহাভিভূত রাখাই তো অভিনয়। বাস্তবতায় অতি ব্যস্ত বলে যারা আজ পরিচিত, তারা আজও এই অভিনয়কে, পিকিং অপেরার চিরন্তন ধারাকে, সবচেয়ে বেশি সম্মান দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে এই কারণে যে, এর প্রতি যুগ-যুগান্তরের জনগণের যে প্রীতি রয়েছে, সেই প্রীতিই এই বিশেষ ও বিশিষ্ট নাট্যসৃষ্টিকে জন-সংযোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহক করে রেখেছে। আর্টের জন্যই আর্ট কথাটাকে নয়া চীন বড় বেশি মূল্য দেয় না। তারা বিশ্বাস করে আর্টের স্বধর্ম হচ্ছে লোকোন্নয়ন এবং জন-সম্বর্ধনায় গরীয়ান আর্টই হচ্ছে যথার্থ জাতীয় আর্ট। আলোচ্য অপেরাটির দেব-বানর সংগ্রাম এই বুড়ো বয়সেও তেমনি উপভোগ করলাম, শৈশবে-কৈশরে যেমন উপভোগ করতাম সেকেলে যাত্রার যুদ্ধ। তা উপভোগ করা সম্ভব হোলো বানররূপী ওয়াং মিং-চান এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী দেবকুলের অভিনয়ের জন্য যেমন, তেমন আবহস্রষ্টা যন্ত্রশিল্পীদের নৈপুণ্যের জন্যও। অতীত দিনের পালা-যাত্রা রণ-বাদ্য দিয়ে দর্শক-চিত্ত নাচিয়ে তুলত। উন্মাদনা সঞ্চারের সহায়ক সেই রণ-বাদ্য আজও মনে পড়ে। যে যুদ্ধাভিনয় চীনে দেখে আজও উপভোগ করলাম, সেই যুদ্ধাভিনয় যাত্রার আসরে কতবারই না দেখেছি। আমাদের আজকার যাত্রায় তার আর স্থান নেই কিন্তু চীন তার পরম্পরাপ্রাপ্ত সংস্কৃতিকে উপেক্ষা তো করেই নি, গবেষণা দ্বারা তাকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে।

আর একখানি ছোট্ট নাটক দেখলাম—'নিন সিয়াং জু লিয়াং পো'। মাত্র তিনটি পুরুষ চরিত্র নিয়ে রচিত এই নাটকখানিতে মানুষের

মনের চিরন্তন অহমিকা, ক্রোধ, বিনম্র ব্যবহার ও প্রীতিকে অভিনয়-দ্বারা চমৎকার করে ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রোগ্রামে এর কোন ভাষ্য ছিলনা। তবে মনে হয় আজ আলোচনা দ্বারা বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নয় বলে যে বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছে, তাকে জন-মনে জাগাবার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই নাটকখানি পরিবেশন করা হচ্ছে। এই দিক বিচার করলে একে আধুনিক বলে মেনে নিতে কোন বাধা থাকে না ; এর টেকনিক যাই হোক না কেন। এটি হচ্ছে সেই সময়ের গল্প নিয়ে রচিত, যখন চীনের বহু-বিভক্ত রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করত। রচনার সময় আমার জানা নেই। গল্পটি এই :

চাও রাজ্যের রাজা তাঁর সভাসদ নিন সিয়াং জু'র বীরত্বের, দূরদর্শিতার রাষ্ট্র-শাসন ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় পেয়ে তুষ্ট হয়ে তাকে মহামাত্যপদে অভিষিক্ত করলেন। একদিন নিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার পথে মার্শাল লিয়াঙ-পোকে দেখতে পেয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। লিয়াঙ-পো তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি নিনকে অপমানিত করবার জন্য তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। নিন বুঝলেন মার্শাল বিরোধ করতে বদ্ধ-পরিকর কিন্তু একথাও তিনি স্থির জানতেন যে তাঁদের বিরোধ রাষ্ট্রের ক্ষতি করবে। তিনি তাই লিয়াঙ-পো'র অপমান গায়ে না মেখে অন্যপথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তখনো লিয়াঙ-পো তাঁর পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়ালেন। তিনবার নিন মার্শালকে পাশ কাটিয়ে এগুবার চেষ্টা করলেন, আর তিনবারই মার্শাল তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। মার্শাল যত ক্রুদ্ধ হন, নিন সিয়াং জু তত ধৈর্যের পরিচয় দেন এবং ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য মার্শালকে এড়িয়ে চলে যেতে সক্ষম হন।

জু চিন ছিলেন রাজার আর একজন সভাসদ। তিনি মার্শালকে

বুঝিয়ে দেন সাধু প্রকৃতির নিন স্নিয়াঙ জু'র সঙ্গে অকারণে একটা বিরোধ সৃষ্টি করে কেবল যে নিজেকেই ছোট করছেন তা নয় — রাষ্ট্রের অমঙ্গলকেও ডেকে আনছেন। জু চিন শুভক্ষণে কথাটা তুলেছিলেন, হয়ত তাই মার্শাল লিয়াঙ-পো নিজের দোষ বুঝতে পারলেন। তিনি একখানি বেত হাতে নিয়ে লিয়াঙ-পো'র বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন এবং বিস্মিত লিয়াঙ-পো'র হাতে বেতখানা তুলে দিয়ে বল্লেন যে, দাম্ভিকতায় ও ঔদ্ধত্যে অন্ধ হয়ে তিনি রাষ্ট্রের মহা অনিষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিলেন বলে তিনি মহামাত্যের কাছে শাস্তি যাচ্ঞা করছেন। মহামাত্য নিন সিয়াঙ জু বেতখানা ফেলে দিয়ে মার্শাল লিয়াং-পোকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এইটুকু ঘটনা। কিন্তু নাটকের প্রাণবস্তু উচ্চাঙ্গের। অনুরূপ ঘটনার কথা চীনের মুক্তি-সংগ্রামের দিনেও ঘটে গেছে। তার কোন ইঙ্গিত এতে আছে কিনা জানি না। তাও হাত পারে অথবা এর পরিবেশনার কারণ আগে যা বলেছি তাও হতে পারে। আবার তু'এর কোনটাই হয়ত কারণ নয়, হয়ত সত্যই প্রাচীন গল্প। কিন্তু জেনিভা সম্মেলনে সমবেত পাশ্চাত্য প্রতিনিধিদেরকে আমন্ত্রণ করে চৌ-এন-লাই এই নাটকখানির চিত্ররূপ দেখিয়েছিলেন বলে হালে জানা গেছে। নাটকখানি সত্যকারের অভিনয় দ্বারা উজ্জ্বল হয়েছে এবং মানুষের মনকে কলুষমুক্ত করবার প্রয়াস এতে রয়েছে। অভিনয়ে ইয়ান সি-হাই আর লি হো-সেঙ অনুপম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

পিকিংয়ে তৃতীয় যে নাট্যাভিনয় দেখি তার নাম লিয়াঙ শ্যান-পো ও চু ইউ-তাই। সমগ্র নাটকখানি পিকিংয়ে দেখানো হয় সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী পিকিংয়ে ছিলেন না বলে। তাঁদের তখন গ্রীষ্মের ছুটি। পিকিংয়ে দেখি মাত্র একটি দৃশ্য। এখানি সম্পূর্ণ

পিকিং অপেরার ধারায় অভিনীত হয়না। বিবাহ সংক্রান্ত নাটক। গল্পটি এই :

চু ইঙ-তাই নামে একটি যুবতী ছিল। একদিন সে তার কুঞ্জে বসে দেখতে পেল একদল ছাত্র উচ্চশিক্ষা পাবার জন্য হ্যাঙচোর পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখে তার ইচ্ছে হোলো সেও দূর বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হবে। মনের ইচ্ছা সে তার বাবাকে জানালে। বাবা বনেদী ঘরের ছেলে। তিনি কি আর মেয়েকে উচ্চ-শিক্ষা পাবার জন্য দূর বিদেশে পাঠাতে চান? মেয়েকে বাপ বুঝাতে চেষ্টা করলেন, তাতে বংশের মর্যাদাহানি হবে। মেয়ে কিন্তু তা বোঝে না। অথচ বাপের অমতে সে যেতেও পারে না। অনেক ভেবেচিন্তে চু-ইঙ তাই এক ফন্দি অাঁটল। গণৎকার সেজে সে বাপের ভাগ্য গণনা করবার জন্য একদিন বাপের সামনে উপস্থিত হোলো। অনেক অাঁক-জোক কেটে গণনার নানা ভান করে সে শোনালে গণনায় সে জানতে পেরেছে যে, বাপ যদি মেয়ের মনোবাঞ্ছা পুর্ণ করতে বাধা দেন, তা'হলে মেয়ের মাথায় বর্ষার বারির মতো অমঙ্গল বর্ষিত হবে। বাপ তখন অনিচ্ছা সত্বেও মেয়েকে অনুমতি দিলেন।

অনুমতি পেয়ে চু ইঙ-তাই ভারি খুশি। পুরুষের পোশাক পরে দিব্যকান্তি একটি তরুণ সেজে সে হ্যাঙচোর উদ্দেশে যাত্রা করল। পথে যেতে যেতে আর একটি ছাত্রের সঙ্গে তার আলাপ হোলো এবং ক্রমে পথের আলাপ প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হোলো; তারা পরস্পরকে ভাই বলে ডাকা শুরু করল।

হ্যাঙচোতে এক বাড়িতে থেকেই তারা পড়াশুনা করতে লাগল। এক এক করে জীবনের তিনটি বছর যে চলে গেল, তা তারা বুঝতেও পারল না। লিয়াং স্যান-পো তখনো বুঝতে

পারল না যার সঙ্গে সে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করেছে, আসলে সে একটি মেয়ে। চু ইঙ-তাই কিন্তু লিয়াঙ স্যান-পোকে মন-প্রাণ সমর্পণ করে বসে আছে। পুরো তিন বছর অতীত হবার পর চু ইঙ-তাই মেয়েকে আদেশ পাঠালেন ঘরে ফিরতে। লিয়াং স্যান-পোকে ছেড়ে যেতে তার মন চায় না অথচ পিতার আদেশও আর লঙ্ঘন করা চলে না। সে তখন স্থির করল লিয়াং স্যান-পোকে সে বিয়েই করবে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো আর বিয়ে করা যায় না। কে সম্বন্ধ উপস্থিত করবে? কে বাপের অনুমতি এনে দেবে? আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা আর দুশ্চিন্তা সইতে না পেরে সে তাদের মাতৃস্থানীয়া অধ্যাপক-পত্নীর কাছে সব-কথা খুলে বল্লে। অধ্যাপক-পত্নী বহু পূর্বেই বুঝেছিলেন চু ইঙ-তাই আসলে যুবতী এবং সহপাঠী লিয়াঙ স্যান-পোকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। তাঁরও আকাঙ্ক্ষা ছিল এরা দুজনে বিয়ে করে সুখী হোক্। তিনি বুঝিয়ে পড়িয়ে চু ইঙ-তাইকে বাপের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, বল্লেন সময় বুঝে তিনিই ঘটকীর কাজ করবেন।

পিতার গৃহে চু ইঙ-তাইয়ের দিন আর কাটে না। অনুক্ষণ সে লিয়াং স্যান-পোর ধ্যানে নিমজ্জিতা থাকে। তার যুবতী পরিচারিকা জেন-সিন একদিন তাকে জানায় যে, মনিব তলে তলে মেয়ের বিয়ের আয়োজন করছেন ধনিক মা-পরিবারের একটি ছেলের সঙ্গে। চু ইঙ-তাইয়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তবুও সে স্থির করল এ-বিয়ে সে কিছুতেই করবে না।

দিন কয়েক পরে সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য লিয়াং স্যান-পো তাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। পরিচারিকা তাকে নিয়ে বসবার ঘরে বসালে। সাম্নে এসে দাঁড়াল নারীবেশে

সজ্জিতা যৌবনোচ্ছলা চু ইঙ-তাই। অপলক তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে লিয়াঙ স্যান-পো বল্লে—"আমি তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।" চু ইঙ-তাই বল্লে আমার দাদাও নেই, ভাইও নেই, বাপের একমাত্র মেয়ে এই চু ইঙ-তাই।"

"তুমি মেয়ে!" লিয়াঙ স্যান-পোর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

"দেখতেই তো পাচ্ছ।" চু ইঙ-তাই জবাব দিল।

"তবে যে তুমি বলতে তোমার বোনের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে?"

"কি করি বল। নিজের বিয়ের সম্বন্ধ নিজে তো আর উপস্থিত করতে পারিনা।"

লিয়াং স্যান-পো নিজেরও অজানায় এই নারীকেই যে ভালোবেসেছিল তাই জানিয়ে বিয়ের সম্মতি চাইল। চু ইঙ-তাই তখন তাকে শোনালে তার বাবার আয়োজনের কথা। লিয়াং স্যান-পোর মাথায় যেন বাজ পড়ল। চু ইঙ-তাই তাকে বল্লে তার বাবা যে বিয়ের আয়োজন করছেন সে বিয়ে সে কিছুতেই করবে না। কিন্তু লিয়াং স্যান-পো জানত বাপের অমতে মেয়ের বিয়ে করবার অধিকার নেই। হতাশ হয়ে লিয়াং স্যান-পো বিদায় নিয়ে চলে গেল এবং কিছুদিনের মাঝেই মারা গেল।

বাপ জোর করে যে বিয়ে দেবার আয়োজন করছিল, সেই বিয়ের দিনই চু ইঙ-তাই লিয়াঙ স্যান-পোর কবরে প্রীতির অঞ্জলি নিবেদন করতে গেল। প্রীতির অঞ্জলি নিবেদন করবার পর চু ইঙ-তাই কবরের পাশেই প্রিয়তমের ধ্যানে যখন নিমজ্জিতা ছিল, তখন সহসা ঘন-ঘন বজ্রপাত হতে লাগল। বিদীর্ণ হোলো

লিয়াঙ শ্যান-পোর কবর। চু ইঙ-তাই কবর-গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রণয়ী-প্রণয়িনী তখন যুগল প্রজাপতি রূপে মুক্ত আকাশে উড়ে গেল।

প্রোগ্রামের ভাষ্যে লেখা ছিল—"এই অপেরা দেখাচ্ছে চীনের অতীত ফিউডাল সমাজে নর-নারীর স্বেচ্ছাজাত বিবাহের কত প্রতিবন্ধকই ছিল এবং কত তরুণ-তরুণীকেই তাই চূর্ণ করবার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে, জীবন বলি দিতে হয়েছে।" হয়ত এই ধরনের গল্পসৃষ্টির মূলে সত্যই ছিল সামাজিক অবিচার। সকল দেশেই ওই অবিচার ছিল এবং সকল দেশের সাহিত্যেই এই ধরনের নানা গল্প পাওয়া যায়। পিকিংয়ে আমাদের দেখানো হয়েছিল কেবলমাত্র প্রণয়ী-প্রণয়িনীর চির-বিদায়ের দৃশ্যটি। এই একটিমাত্র দৃশ্য কেবল অভিনয় দ্বারা এমন রস-ঘন করে তোলা হয়েছিল যে, ভাষার প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মন রসাপ্লুত হয়েছিল। চু ইঙ-তাইয়ের ভূমিকায় অভিনেত্রী তু চিন-ফিঙ এবং লিয়াং শ্যান-পো'র ভূমিকায় ইয়ে সেঙ-ল্যাঙ উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেন।

হ্যাঙচোতে প্রথমবার এই নাটকের পুরো অভিনয় দেখি। হ্যাঙচোর আঞ্চলিক গল্প বলেই হয়ত সমগ্র অভিনয়টি আরো স্বচ্ছ হয়েছিল। মায়াজালের বুনট ঘনতর হয়েছিল। বড়ই উপভোগ্য হয়েছিল প্রণয়ী-প্রণয়িনীর কিশোর পরিচারক দুটির অংশ। নাটকে মধুর রস সমাবেশে তারা কম সহায়তা করেনি। হ্যাঙচোতে কেবল অভিনেত্রীরাই সকল ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন।

হ্যাঙচোতে দ্বিতীয়বার যে অভিনয়টি দেখি এবং যার কিছু কিছু সমালোচনা অন্য নিবন্ধে করেছি—তার নাম 'সি সিয়েন চি।' গল্পটি এই :

তরুণ চাঙ-সেন কবি। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার

পথে এক বৌদ্ধ-মন্দিরে সে বিশ্রামের জন্য কালক্ষেপ করে। সেইখানেই অতি-আকস্মিক ভাবে সে সাক্ষাৎ পায় পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী-তনয়া তরুণী সুই ইঙ-ইঙের। প্রথম দর্শনেই প্রেমের সঞ্চার। চাঙ-সেন মন্দিরের পুরোহিতদের অনুমতি নিয়ে মন্দিরেই থেকে যায়—কেননা সুই ইঙ-ইঙের বাড়ি মন্দিরেরই লাগা।

চাঙ-সেন জানতে পারল সুই প্রতি সন্ধ্যায় বাগানে এসে পিতৃপুরুষদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্য ধূপ পুড়িয়ে যায়। তাই জেনে একদিন সন্ধ্যার পর বাগানের বাইরে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে যখন সে বুঝতে পারে দেয়ালের অপর পাশে সুই ইঙ-ইঙের আবির্ভাব হয়েছে, তখন সে একটি মধুর কবিতা আবৃত্তি করে। প্রত্যুত্তরে সুই ইঙ-ইঙ সেই একই ছন্দের এবং একই ভাবদ্যোতক আর একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। কবিতা বিনিময়ের ভিতর দিয়ে তাদের হৃদয়েরও বিনিময় হয়।

ওই অঞ্চলে এক দস্যু সর্দার ছিল। সে শুনেছিল সুই ইঙ-ইঙ খুবই সুন্দরী যুবতী। তাকে বলপূর্বক নিজের অঙ্কশায়িনী করবার উদ্দেশ্যে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে সে একদিন নগর অবরোধ করল। সুই ইঙ-ইঙের মা ঘোষণা করলেন দস্যুকে হটিয়ে দিয়ে যে তাঁর কন্যাকে রক্ষা করতে পারবে, মোটা যৌতুক দিয়ে তার সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন। চাঙ-সেন ছাড়া কেউ এগিয়ে গেল না। সে তার বন্ধু জেনারেল তু-চিউওকে খবর পাঠিয়ে দিলে। জেনারেল বন্ধুর আহ্বানে সসৈন্যে উপস্থিত হয়ে দস্যু-সর্দারকে দূর করে দিলে।

মাদাম সুই প্রকাণ্ড একটি ভোজের আয়োজন করে চাঙ-সেনকে আমন্ত্রণ করলেন। প্রণয়ী-প্রণয়িনী দুজনেই ভাবলে ওই ভোজ সভাতেই তাদের বিয়ের চুক্তি ঘোষণা করা হবে। কিন্তু

মাদাম তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। তিনি জানালেন এখন থেকে তারা যেন মনে করে তারা ভাই-বোন। তিনি তার বোন-পো চেঙ হঙের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে স্থির করে ফেলেছেন।

চাঙ-সেন একেবারে ভেঙে পড়ল। কিন্তু সুই ইঙ-ইঙের সহচরী তাকে উৎসাহ দিল। সে বল্ল, মায়ের কথায় কি এসে যায়? তুমি রোজ সন্ধ্যার পর বাগানের দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে বীণ বাজিয়ে তোমার প্রেম জানাবে। চাঙ-সেন তাই করতে লাগল। বাগানে বসে সুই ইঙ-ইঙ সেই বীণ শুনতে শুনতে বিরহে ভেঙে পড়ত। আর থাকতে না পেরে সহচরীকে একদিন সে চাঙ-সেনের কাছে পাঠাঁলো। চাঙ-সেন একখানা চিঠি দিল। সহচরী সুই ইঙ-ইঙের হাতে না দিয়ে তার ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দিল এবং লুকিয়ে দেখতে লাগল সুই ইঙ-ইঙ কী করে। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে চিঠিখানা পেয়ে চিঠিখানা সে পড়ল। পড়ে অবশ্য খুশিই হোলো। কিন্তু ভাবল সহচরী হাঙ-নিয়াঙ যদি ঘটনাটা মাকে জানায় তাহলে বড় মুশ্‌কিল হবে। তাই সে রাগের ভান করে সহচরীকে বল্লে—"এখুনি যা তো। আমার এই কথা-গুলো তাকে খুব কড়া করে শুনিয়ে দিয়ে আয় তো!" কথাগুলোয় ইঙ্গিত ছিল চাঙ-সেন যেন রাতে এসে বাগানে তার সঙ্গে দেখা করে। সহচরী হাঙ-নিয়াঙ কিন্তু তা বুঝতে পারল। তাই যা শুধু ইঙ্গিতই ছিল, চাঙ-সেনকে তা সে স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিল। রাত্রে চাঙ-সেন দেওয়াল টপকে সুই ইঙ-ইঙের সঙ্গে দেখা করল। প্রথম-মিলনের পরম মুহূর্তটি অতিক্রান্ত হতেই সুই ইঙ-ইঙ ভাবল সহচরীকে জানিয়ে কাজটা করা ভালো হয়নি—যদি মাকে বলে দেয়। তাই সে বাগান টপকে আসবার জন্য চাঙ-সেনকে হাঙ-নিয়াঙের সামনেই খুব বকে দিল।

এই বকুনি চাঙ-সেনকে খুবই ব্যথা দিল। সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুখের খবর শুনে সুই-ইঙ-ইঙ হাঙ-নিয়াঙকে তার কাছে পাঠালো। হাঙ-নিয়াঙ বল্লে খুব বড় ডাক্তারের এক প্রেস্ক্রপশন নিয়ে সে এসেছে। সে একখানা চিঠি দিল—সুই ইঙ-ইঙ লিখেছে। চিঠি পড়তেই চাঙ-সেনের অসুখ সেরে গেল। সুই ইঙ-ইঙ সেই রাত্রেই লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে গেল।

কানা-কানি হতে হতে এই গোপন অভিসারের কথা মাদাম সুইয়ের কানে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি তার বোন-পোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলবেন স্থির করলেন। কিন্তু হাঙ-নিয়াঙ ইঙ-ইঙ ও চাঙ-সেনের মিলনের স্বপক্ষে এমন সব কথা বল্লে, যার যুক্তি মাদাম উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি বল্লেন, চাঙ-সেনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁর আপত্তির কারণ এই যে, এই পরিবারের কোন মেয়ে সরকারী কর্মচারী ছাড়া কাউকে বিয়ে করেনি। চাঙ-সেন তা নয়। সে যদি রাজধানীতে থেকে পড়াশুনা করে পরীক্ষায় পাশ দিয়ে সরকারী কর্মচারী হবার নিয়োগ-পত্র হাতে নিয়ে তাঁর মেয়ের পাণিগ্রহণ করতে চায়, তাহলে আর তিনি আপত্তি করবেন না। মুখে তাই বল্লেন, কিন্তু মনে মনে ঠিক করে রাখলেন চাঙ-সেনকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বোন-পোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন।

চাঙ-সেন আর সুই ইঙ-ইঙ বুঝল মায়ের আদেশ মতো সরকারী চাকরি যোগাড় করা ছাড়া আর উপায় নেই। পরস্পরের আমরণ ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি বিনিময়ের পর প্রণয়ী-প্রণয়িনী বিদায় নিল। সূর্য তখন অস্তাচলগামী।”

এই ক্যাণ্টোতেই আগের বার 'লিয়াং স্যান-পো আর চু ইঙ-তাই'

নাটকের অভিনয় দেখে যত খুশি হয়েছিলাম, এ নাটকের অভিনয় দেখে ততো খুশি হতে না পারলেও বলতে পারিনা যে অভিনয় নিরেশ হয়েছিল। প্রত্যাশা বেশি ছিল। ভালো লাগেনি দৃশ্যপট নিয়ে যে স্বেচ্ছাচারের পরিচয় এতে পেয়েছি তাই। সে-কথা অন্যত্র বলেছি।

তিনজিনে একখানি নাটকের অভিনয় দেখেছি যাকে ওপরে বর্ণিত ওই সি সিয়েন-চি নাটকের উপসংহার বল্লে অন্যায় বলা হয় না। তার গল্প এই :

মা যখন জানলেন মেয়ে একটি গরীব ছেলেকে বিয়ে করতে চায়, তখন তিনি ভারি ক্ষেপে গিয়ে ছেলেটিকে তাড়িয়ে দিলেন এবং অন্যত্র মেয়ের বিয়ে দেবার আয়োজন করতে লাগলেন। ছেলেটি কিন্তু আদৌ গরীব নয়, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। মায়ের আসল রূপটি প্রকাশ করে দেবার জন্যই সে গরীবের ছদ্মবেশে তাঁর মেয়ের পাণি-প্রার্থনা করেছিল। মা যখন মেয়ের ওপর বড় বেশি জুলুম করতে লাগল, তখনই ছেলেটি আত্মপ্রকাশ করল। সমগ্র গল্পটা মনে নেই। তবে অভিনয় ভালো লেগেছিল।

হ্যানকিংয়ে দেখেছিলাম 'দি বুদ্ধ-স কয়েন', যার উল্লেখ আগে করেছি। সুন্দর নাটক, অভিনয় অধিকতর সুন্দর। গল্পটি এই :

ছুতোর-মিস্ত্রী চাঙ আর সিয়াঙ ফিয়াই-উয়ো চ্যাঙ চিয়া চুয়ান গাঁয়ের স্বল্প একটি পরিবারের স্বামী-স্ত্রী। তাদের একমাত্র কন্যা আই-আই, নির্মলা সরলা কুমারী। গাঁয়ের একটি কৃষক পরিবারের সন্তান সিয়াও-ওয়ানের সঙ্গে সে প্রণয়াবদ্ধ হয়। তাদের বিয়ে হলে তারা ব্যক্তিগতভাবেই যে কেবল সুখী হয় তা নয়—গাঁয়ের আদর্শ-দম্পতিরূপে বিবেচিত হবারও যোগ্যতা রাখে তারা। তা হলে হবে কি? গাঁয়ের কয়েকজন কৃষক আর বিশেষ করে গাঁয়ের মোড়ল এ বিবাহের বিরোধী। কৃষকরা মনে করে আই-আই

বড় বেশি স্বাধীন প্রকৃতির মেয়ে, যা তার হওয়া উচিত নয়। মোড়লও তাই মনে করে, মেরে-পিটে গড়ে নিতে পারলে ভবিষ্যতে আই-আই ভালো বউ হতে পারে। তার বোন-পোর জন্য একটি সুপাত্রী চাই, কৃষক সন্তান সিয়াও-ওয়ান তাকে বিয়ে করলে গাঁয়ের সেরা পাত্রীটি হাতছাড়া হয়ে যায়।

কিন্তু এক দীপালী উৎসবে আই-আই আর সিয়াই-ওয়ান পরস্পরকে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আই-আই তার প্রণয়ীকে তার আংটি উপহার দেয়, আর সিয়াই-ওয়ান দেয় একটি বুদ্ধ-মুদ্রা। বুদ্ধ-মুদ্রা ছিল বিশ্বস্ততার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। উৎসব-অন্তে আই-আই বাড়ি ফিরে স্বপ্ন নিয়ে। বুদ্ধ-মুদ্রাটি হাতে নিয়ে মায়ের বিছানায় শুয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। বুদ্ধ-মুদ্রাটি তার হাত থেকে পড়ে যায় বিছানার ওপর।

মা ফিরে এসে দেখেন মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। উৎসব-ক্লান্ত মেয়েকে আদর করবার জন্য তার কাছে যেতেই তিনি দেখতে পেলেন একটা বুদ্ধ-মুদ্রা বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে। তিনি চমকে উঠে তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে বিছানার কাছ থেকে সরে গেলেন। অপলক মুদ্রাটির দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর জীবনের বড় বেদনাময় স্মৃতি জেগে উঠল। প্রথম যৌবনে পাওয়া এই বুদ্ধ-মুদ্রা তাঁর মেয়ের কাছে গেল কেমন করে? তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর গয়নার বাক্স খুলে দেখে আবারও চমকে উঠলেন। কি আশ্চর্য! তাঁর মুদ্রাটি যেখানে রেখেছিলেন ঠিক সেইখানেই তো আছে! তবে কি মায়ের মতো মেয়েও কাউকে বিয়ে করবার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই মুদ্রাটি পেয়েছে? বাক্স থেকে নিজের মুদ্রাটি তুলে নিয়ে দুটি মুদ্রা পাশাপাশি ধরে তিনি ভাবতে লাগলেন

মুদ্রা দুটি যেমন অবিকল এক, মা আর মেয়ের ভাগ্যও কি তেমনই অভিন্ন হবে! তাঁর মুদ্রাটি তিনি যেদিন পেয়েছিলেন, সে-দিন ভেবেছিলেন তাঁর মতো সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখে তিনি বুঝলেন, সেও নিজেকে তাই ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি তো যাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাকে বিয়ে করতে পারেননি, মেয়েও যদি না পারে? তা না পারবার দুঃখ যে কি দুঃসহ, তাতো তিনি জানেন। তার মেয়েকেও কি তেমনই দুঃসহ দুঃখ বহন করে সারাজীবন কাটাতে হবে? আর শুধুই তো দুঃখ নয়, লাঞ্ছনা নির্যাতনই কি তাকে কম সইতে হয়েছে? বিয়ের আগে প্রণয়াবদ্ধ হয়েছিলেন বলে শাশুড়ি যখন তখন কেবল গঞ্জনাই দিতেন না, ছেলেকে প্ররোচনাও দিতেন স্ত্রীকে প্রহার করে-করে চরিত্র শুধরে দিতে। মায়ের আদেশে ছেলে তাই-ই করত। নব-বধূ ছিলেন যখন, তখনই তো স্বামী বেত মেরে মেরে তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দিত বিয়ের আগে অপর পুরুষকে ভালোবেসেছিলেন বলে। দেহ দেননি, মন দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীকে একনিষ্ঠ সেবা দিয়েও তো রেহাই পেলেন না। মেয়ের অদৃষ্টেও কি তেমনই দুঃখ, তেমনই নির্যাতন, তেমনই লাঞ্ছনা তোলা রয়েছে? মা একবার নিজের হাতের মুদ্রা দুটির দিকে চেয়ে দেখেন, আবার চেয়ে দেখেন ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে।

বাইরে স্বামীর পদশব্দ হয়। মা তাড়াতাড়ি দুটি মুদ্রাই তাঁর বাক্সে লুকিয়ে রাখেন। স্বামী ঘরে ঢুকতেই বোঝা যায় কোন কারণে সে চটে আছে। মেয়েকে শুয়ে থাকতে দেখে সে বলে—"ওই ধাড়ী মেয়েটা এ বিছানায় শুয়েছে কেন?" "আহা! ক্লান্ত হয়ে এসেছে।"—মা বলেন। "ক্লান্ত হয়ে থাকে নিজের ঘরে,

নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকুক না কেন!”—বাপের নির্দেশ। মা ঘুমন্ত মেয়েকে জাগিয়ে তুলে তার ঘরে দিয়ে আসেন।

তিনি ফিরে আসতেই স্বামী বলেন—“ধাড়ী মেয়ের বিয়ে দেবেনা, ঘরে পুষে রাখবে। গাঁয়ে কান পাতা যায়না তোমার মেয়ের নিন্দায়।”

“নিন্দুকদের কথায় কিছু এসে-যায়না। তবে ওর এখন বিয়ে দেওয়াই উচিত।”

“উচিত মনে কর যদি দাও বিয়ে।”

“পাত্র তো দেখতে হবে।”

“পাত্র তো আছেই, মোড়লের বোন-পো। ঘটকীকে খবর দাও ”

“আমি নিজে কথা বলতে চাই মোড়লের বোনের সঙ্গে।”

“তাও আবার হয় নাকি!”

“কেন হবে না?”

“মেয়ের মা যেচে যাবে ভাবী কুটুমের বাড়ি মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে! এ সমাজে তা কখনো হয়?”

“তা কেন। আমি যাব আমার মাকে দেখতে, ঘটকীকে পাঠিয়ে দোব মোড়লের বোনের বাড়ি। তারপর আমি ফেরবার পথে যেন ঘটকীকে ডাকতে গেছি, সেই ভাবেই সেখানে গিয়ে হাজির হব। ঘটকীই তখন বিয়ের কথা তুলবে। তাহলে তো মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যেচে যাওয়া হবে না।”

তাই ঠিক হলো। নিজের মায়ের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফেরবার মুখে যেন ঘটকীকে ডাকতে গেছেন এই ভাবেই সিয়াও ফিয়াই-উয়ো মোড়লের বোনের বাড়ীর আঙিনায় গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু মোড়লের বোনের উঁচু গলার কথা শুনে আর অগ্রসর

হলেন না। ঘটকীকে সে বলছে—"কেমন করে ওই মেয়ের চরিত্র আমি শুধরে নোব? যেমন ছিল মা, তেমনই হয়েচে মেয়ে!"

সিয়াও ফিয়াই-উয়োর পিঠে যেন চাবুক পড়ল। তবুও সে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘটকী বল্লে—"বিয়ের পর উঠতে বসতে বেত মেরো, সব ঠিক হয়ে যাবে। ব্যথাই সব চেয়ে বড় শিক্ষক।"

—"কিন্তু ওর দেহে যে রয়েছে ওর মায়ের রক্ত।"

—"মিস্ত্রী চাঙ কি বেত মেরে মেরেই ওই মাকে ঢিট্ করেনি?"

সিয়াও ফিয়াই-উয়ো আর সেখানে দাঁড়াতে পারলনা। তার সম্বন্ধে, তার মেয়ের সম্বন্ধে ওই হীন ধারণা যে পোষণ করে তার ছেলের সঙ্গে কিছুতেই সে মেয়ের বিয়ে দেবে না। আর ওই ঘটকী? ওই দু-মুঁখো সাপকে সে বাড়ীতে ঢুকতেও দেবেনা। মারবে! বাড়ী ফেরবার সারা পথটা সে ভাবতে ভাবতে চল্ল—মেরে ঢিট করবে বিয়ের পর? আমাকে যেমন আমার স্বামী মেরে ঢিট করেছে! এত বড় কথা ওরা বলতে পারল! আমার মেয়েকে মারবে, আর তাই শুনেও ওই ঘরে আমি মেয়ের বিয়ে দোব? কখনো না, কিছুতেই না।

পেছন থেকে ছুটে এসে স্বামী জিজ্ঞাসা করল—"কি হলো বিয়ের?"

—"ওখানে হবেনা।"

—"কেন!"

ঘাড় ঘুরিয়ে স্বামীর মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি ফেলে সে বল্লে—"তুমি তা বুঝবেনা।"

এ মূর্তি স্বামী কখনো দেখেনি। ভয় পেয়ে সে আর কোন প্রশ্ন করল না।

বাড়ী ফিরে মা দেখে মেয়ে যেন সারা ঘরময় কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ব্যথায় আর শ্রমে সে যেন কালি হয়ে গেছে। নিঃশব্দে মা তার বাক্স খুলে দুটি মুদ্রাই বার করলে। তারপর নিজেরটা মুঠোর মাঝে রেখে মেয়ের বুদ্ধ-মুদ্রাটি মেয়েটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"এইটিই খুঁজছিলে কি?"

মেয়ের মুখ হাসিতে ভরে গেল। "দুষ্টু-মা, মেয়ের বুদ্ধ-মুদ্রা চুরি করেছিলে?" বলতে বলতে মেয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকালো।

মা মুদ্রাটি মেয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লে—"চুরি করতে যাব কেন মা? আমার কি নেই ভেবেছ? এই ছাখ।" নিজের মুদ্রাটি মেয়েকে দেখালে।

—"কে দিয়েছিল, মা? বাবা?" মেয়ের কৌতূহল।

মা শুধু বল্লে—"না।"

মেয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখল তার দু'গাল বয়ে অশ্রুর ধারা নেমেছে।

—"মা, তুমি কাঁদছ কেন?"

মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে মা বল্লে—"ওরে এই বুদ্ধ-মুদ্রা পেয়ে ভেবেছিলাম জীবনে অফুরন্ত সুখ পাব।"

—"পাওনি মা?"

—"তুই কোলে আসবার আগে একদিনের জন্যও পাইনি। তুই এলি, সব দুঃখ ভুলে তোকে বড় করে তুল্লাম। মনে মনে স্থির করলাম আমার যা হয়েছে হয়েছে, তোকে দুঃখ পেতে দোবনা। কিন্তু তোর হাতের বুদ্ধ-মুদ্রা দেখে ভয়ে আমার বুক কাঁপে।"

—"কিচ্ছু ভেব না মা, আমার সুখ কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা।"

কিন্তু চাষীর ছেলে সিয়াও ওয়ানের সঙ্গে আই-আইয়ের কিছুতেই আর বিয়ে হয়না। কেননা মোড়ল সুপারিশ না করলে রেজিষ্ট্রেশন পাবার উপায় নেই। তা ছাড়া ছেলের বাপ-মায়ের মতই বা আনে কে ?

আই-আইয়ের দু'বছরের বড় ওই গাঁয়েরই মেয়ে মা ইয়েন-ইয়েন ছিল আই-আইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারও জীবন দুঃখময় ছিল সে যাকে ভালোবাসে তাকে বিয়ে করতে পারছেনা বলে। গাঁয়ের মোড়ল তাদেরও মিলনের বিরোধিতা করছে। সে স্থির করল তার যাই হোক আই-আইয়ের জীবন সে ব্যর্থ হতে দেবেনা। সে সিয়াও ফিয়াই-উয়ো আর মিস্ত্রী চাঙকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করালে সিয়াও ওয়ানের সঙ্গে তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে। ছেলের বাপ-মাও তার আকুতি দেখে এবং ছেলের কথা ভেবে মত দিতে রাজি হোলো। প্রতিবাদী রইল কেবল গাঁয়ের মোড়ল। কিছুতেই সে বিয়ের সুপারিশ করে রেজিষ্ট্রারকে চিঠি দেবেনা। তাকে অগ্রাহ্য করে মা ইয়েন-ইয়েন তাদেরকে নিয়ে চল্ল রেজিষ্ট্রারের কাছে—নিজের প্রণয়ীকেও সঙ্গে নিতে ভুল্লনা। কিন্তু রেজিষ্ট্রার বল্লেন, গাঁয়ের মোড়লের সুপারিশ না পেলে কিছুতেই তিনি রেজিষ্ট্রেশন করবেননা। বড় ব্যথা নিয়ে চারটি যুবক-যুবতী গাঁয়ে ফিরে এলো, কিন্তু হতাশায় ভেঙে পড়ল না। প্রয়োজন হলে তারা বিদ্রোহ করবে। বিনা রেজিষ্ট্রেশনে তারা তো বিয়ে করবেই, কাউকেই রেজিষ্ট্রেশন করতেও দেবেনা।

কিন্তু বিদ্রোহ তাদেরকে করতে হোল না। নতুন বিবাহ-আইন (এখনকার আইন) জারি হয়ে গেল। জেলা থেকে গাঁয়ে

গাঁয়ে সমাজ-কর্মীরা ছড়িয়ে পড়লেন। এ গাঁয়েও এলেন একজন প্রধান ব্যক্তি। বিবাহেচ্ছুরা গাঁয়ের মোড়লের সুপারিশ ছাড়াও রেজিষ্ট্রেশন পেতে লাগল। সমাজ-কর্মীর নায়ক গাঁয়ের মোড়লকে আর বুড়ো-বুড়ি লোকদেরকে বুঝিয়ে দিলেন বয়স্কদের বিয়ের ব্যাপারে জুলুম-জবরদস্তি চলবেনা। আই-আই আর মা ইয়েন-ইয়েনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আর কেউ তাদের বিয়ে বন্ধ করতে পারবেনা! আই-আই মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে—"মা, বুদ্ধ-মুদ্রা আমার জীবনে অনন্ত সুখ এনে দেবে।" মা কোন কথা বল্লেনা। তার দুগাল বেয়ে আজও অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। মা ভাবছে তার অতীত দিনের কথা। এই আইন তখন জারি হলে জীবনে এত দুঃখ তাকে পেতে হোত না।

আই-আই বল্লে—"আমার সুখ কি তোমার দুঃখের কারণ হয়ে উঠল, মা?"

মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে মা বল্লে—"ওরে না, না, আমারই মতো সেই অসংখ্য অভাগীদের জীবনের সকল দুঃখ আমারই বুকে জমে উঠল এই ভেবে যে মানুষের জন্য মানুষের গড়া এই আইন আরো অনেক আগে বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। যদি হোতো, কত নারীই না আজ আনন্দের অধিকারিণী হতে পারত।"

গল্পটি আধুনিক। 'চাইনিজ লিটারেচার' কাগজে এই গল্পটিই অবিকল প্রকাশিত হয়েছে 'রেজিষ্ট্রেশন' নামে (সম্প্রতি পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে)। তাতে বলা হয়েছে এটি ১৯৫০ সালে রচিত—নতুন বিবাহ আইন চালু হবার সময়। সে যাই হোক বুদ্ধ-মুদ্রা নাটকটি গল্পের জন্য যতো-না মনকে আকৃষ্ট করে, তার চেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে মায়ের চরিত্রের নাটকীয় বিকাশের জন্য। সেই নাটকীয় রস ঘনীভূত হয়ে ওঠে মেয়ের জীবনের গতির সঙ্গে

মায়ের জীবনের পরিণতির সমান্তরাল প্রতিফলনের শিল্পশৈলীর ভিতর দিয়ে। নাটকের পরিণতি শুধু নতুন বিবাহ আইনের ব্যাখ্যায় শেষ হলে নাটক ঝুলে পড়ত। কিন্তু সেখানেও যে-মুহূর্তে মায়ের মনে নিজের অতীত দিনের স্মৃতি এবং তার সমসাময়িক অসংখ্য নারীর স্মৃতি জাগিয়ে তুলে মাকে ব্যথাতুরা অশ্রুসজলা করে তুলে এবং মেয়েকে দিয়ে একটি সংশয়াত্মক ছোট্ট প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সেই মুহূর্তেই নাটকের বিবাহ আইন-প্রচারণাকেও চাপা দিয়ে মানবতার মহিমায় ভাস্বর করে তোলা হয়েছে। অভিনয় হয়েছে অনবদ্য। প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত হয়েছে প্রত্যেকটি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নৈপুণ্যে। মায়ের ভূমিকাভিনেত্রী ইয়েন-চেন নিরুপম অভিনয় নৈপুণ্য দিয়ে অভিনয়কে আধ্যাত্মিক স্তরে তুলে দিয়েছেন। তাঁর কথা অন্যত্র বলেছি। মেয়ে আই-আই, তার বন্ধু মা ইয়েন-ইয়েন দুটি অভিনেত্রীই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, মিস্ত্রী চাঙ আর গাঁয়ের মোড়ল দুজনাই চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন, প্রণয়ী দুটিও তাই। যে-কোন দেশে এ নাটকখানি একখানি ভালো আধুনিক নাটক বলে অভিনন্দন পেতে পারে। মায়ের গানটা অবশ্য বাহুল্য মনে হয়েছে, আর অনাবশ্যক না হলেও জেলা কর্মচারীর নতুন বিবাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা একটু বেশি টানা হয়েছে। নয়া চীন নতুন বিবাহ আইন করে হাজার হাজার বছরের সামাজিক ব্যাধি দূর করতে উদ্যত হয়েছে। কোটি কোটি নর-নারীর কু-সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করবার প্রয়োজনীয়তা আজ বড় হয়ে উঠেছে। তাই বিবাহ ও বিবাহ আইন প্রচারণাকে নাটকের বিষয় করে নিয়ে সর্বত্র তা অভিনয় করতে হচ্ছে। এ যে জাতির প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূর্ণ করতে উদ্যত হয়ে নাট্যকাররা ও পরিচালকরা যদি নাটকের নাটকত্ব উপেক্ষা করে চলতেন, তাহলে নাটকগুলি আমাদের খুশি করতে পারত না। কিন্তু যে ক'খানা

বিবাহ সংক্রান্ত নাটক আমরা দেখেছি, সব ক'খানিতেই নাট্য-রসের স্বাদ পেয়ে তৃপ্ত হয়েছি, প্রচারণা থাকা সত্ত্বেও। অবশ্য আমি নিজেও একজন প্রচারধর্মী নাট্যকার।

সাংহাইতে বিস্ময়কর অভিনয় দেখেছি চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা চৌ সিন-ফ্যাঙের—'নগর-প্রাচীরে ভ্রাম্যমান স্থ সা' নামক নাটকে। ভাষা বুঝিনা, সুরও একেবারেই বিদেশী। তবুও এই মহান শিল্পী এমনই অভিনয় করলেন, বিশেষ করে শেষ বিশ মিনিট কাল বাচনে গানে নৃত্যে একা মঞ্চ অধিকার করে যে রস-সৃষ্টি করলেন, তা আমাদিগকে অভিভূত আচ্ছন্ন করে ফেল্ল। অসাধারণ শক্তির অধিকারী এই প্রবীণ অভিনেতা চৌ সিন-ফ্যাঙ। প্রথম সারা চীন ক্লাসিক ও লৌকিক নাট্য-অভিনয় উৎসব উৎসব, তাঁর শক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছিল সম্মান-পুরস্কার দিয়ে। শুধু ভারতীয় অতিথিদেরকে অভিনয় দিয়ে অভ্যর্থনা করবার জন্যই তিনি সেদিন অভিনয় করবার কষ্ট স্বীকার করেছিলেন ইস্ট চায়না পিকিং অপেরা একসপেরিমেণ্টাল ট্রুপের সঙ্গে। মি ল্যান-ফ্যাঙের প্রবন্ধে পড়েছি এই চৌ সিন-ফ্যাঙও মি ল্যান-ফ্যাঙের মতোই প্রতিক্রিয়াশীল মনে করে তাঁর খ্যাতির বাহক বহু নাটক অভিনয়ের অযোগ্য বলে বর্জন করেছেন। সে দিন অভিনয় অন্তে তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। আজও তাঁর স্মৃতি মনে উজ্জ্বল রয়েছে।

এই প্রসঙ্গ শেষ করব এমন একখানি নাটকের আলোচনা করে যার অভিনয় দেখিনি, দেশে ফিরে দু'তিনবার যা ফিরে ফিরে পড়েছি। এই নাটকখানির নাম হচ্ছে চু ইউয়ান। এর রচয়িতা বর্তমান গবর্নমেন্টের সহকারী-প্রধানমন্ত্রী, চায়না পীস কমিটির চেয়ারম্যান, কবি ঐতিহাসিক, কুয়ো-মো-জো।

চু ইউয়ান খৃষ্টপূর্ব ৩৪০ সময়কার লোক। সর্বকালের চীন-সাহিত্যিকদের এই মত যে, কাব্য-প্রতিভার যে-পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তার তুলনা চীন সাহিত্যে নেই। বর্তমান কালের চীন নায়করা যেমন সেই কারণে, তেমন জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দু'হাজার বছরের আগেকার আমলের কবিকেও বিচলিত করেছিল জেনে (কবিতার এবং ইতিহাসেরও মারফত) গৌরব অনুভব করেন। তার চেয়েও বড় কথা এই যে, জনগণও বংশপরম্পরায় দু'হাজার বছরকাল এই কবির তিরোধানের দিনে চীনের সর্বত্র স্মৃতি-উৎসব পালন করেন। জাতীয় কবিকে নিয়ে এত দীর্ঘকাল জাতির জনগণের (শিক্ষিতদের নয়) স্মৃতি-উৎসব পালনের দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা আমি জানি না। চিরাচরিত এই স্বতঃস্ফূর্ত জনোৎসব থেকে এই কথাগুলিই জানা যায়ঃ (১) চু ইউয়ান তাঁর সম-সাময়িক জনগণের অন্তরের ব্যথাকে রূপ দিয়ে তাদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন ; (২) সে শ্রদ্ধা এতই অকৃত্রিম ছিল যে পুরুষ-পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে তা ভক্তিতে রূপান্তরিত হলো ; (৩) চু ইউয়ান যে দুঃখ দুর্দশার কথা দু'হাজার বছরেরও আগে কবিতায় ব্যক্ত করেছিলেন দু'হাজার বছর-কাল চীনের জনগণের পক্ষে তা বাস্তব ছিল। নইলে তারা চু ইউয়ানের স্মৃতি-উৎসব বংশ-পরম্পরায় করে যেতে পারতনা ; (৪) নিজেদের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে চীনের জনগণ একেবারে অচেতন ছিল না। কাজেই জন-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতৃরা চীনের এই প্রাচীনতম জাতীয় কবিকে নয়া সাহিত্যে ও নয়া নর-নারীর চিত্তে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়াস অবশ্যই করবেন। কুয়ো মো-জোর চু ইউয়ান নাটক হচ্ছে সেই প্রয়াসেরই আধুনিকতম পরিচয় এবং সার্থক পরিচয়। কুয়ো মো-জো অনূদিত চু ইউয়ানের কাব্য-সংগ্রহখানি পড়বার সুযোগও আমার হয়েছে। পড়ে বুঝেছি শুধু লোক-চিত্তের আবেগই চু ইউয়ানের কাব্যের উৎস

নয়, লোকোত্তরের আবেদনও তাঁর কাব্যের দুর্বার প্রেরণা। জীবনে চু ইউয়ান জাতির জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার করতে না পেরে, স্ব-রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে না পেরে হতাশায় ভেঙে পড়ে প্রথমে আত্ম-গোপন করেছিলেন এবং পরে নদী-গর্ভে আত্ম-বিসর্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু কাব্যে সেই হতাশার কুয়াশায় অমৃত-লোকের আলো ঢেলে জীবনকে তিনি দিয়েছেন এক মোহন রূপ। কুয়ো মো-জো তাঁর নাটকে চু ইউয়ানের জীবনের দুটো দিকই সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই কবিতা-আবৃত্তি নাটকে অপরিহার্য হয়েছে। আমাদের দেশের দুটি প্রগতিশীল নাট্যপ্রতিষ্ঠানের দুজন পরিচালক এই কবিতা-আবৃত্তি অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। আমি তা করিনা। আমি একে কেবল প্রয়োজনীয়ই মনে করি না, স্বাভাবিকও মনে করি। আধুনিক নাটকে কবিতার স্থান নেই, স্বগতোক্তির স্থান নেই, দীর্ঘ-ভাষণের অবসর নেই—একথা আমি মানিনা। অপ্রয়োজনে ওসব কিছুরই দাবি থাকে না, কিন্তু প্রয়োজনে থাকে। মানব-প্রেমিক কবির জীবন নিয়ে যে মানব-প্রেমিক নাটক লিখবেন তিনি কবিতা আবৃত্তি বাদ দিতে পারবেন না, কবির ভাবাবেগকে রূপ দিতে আবেগ-পূর্ণ ভাষণও বর্জন করতে পারবেন না। চেষ্টা করে তা যদি করেনও, চরিত্র অবাস্তব হবে। সক্রেটিসকে নিয়ে যে ভাবে নাটক লেখা যায় শেলীকে নিয়ে সে-ভাবে নাটক লেখা যায় না। কবির জীবন-নাট্যে কাব্যের এই অপরিহার্য দাবি উপেক্ষা করা হয়েছিল বলেই আমাদের মঞ্চে অভিনীত চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি সার্থক সৃষ্টি হয়নি। মঞ্চে অভিনীত দুইটি মাইকেলের একটি সার্থক হয়েছে, একটি হয়নি। চু ইউয়ান নাটকের শেষের দিকে যে-ভাবে নিজের দুঃসহ বেদনা ব্যক্ত করবার জন্য চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র বজ্র বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝা প্রভৃতির কাছে অভিযোগ করেছেন, আবেদন জানাচ্ছেন, নাট্য-সাহিত্যে তা অচল নয়। শেকসপীয়ারেই তা

শুরু হয়নি, শেকসপীয়ারেই তা শেষ হয়নি। নানা দেশের নানা কালের নাট্য-সাহিত্যে তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এ-কথাও হয়ত বলা যায় যে, নাট্যকার পরিকল্পিত লীয়ার সাজাহান কবি ছিলেন না বলে এ প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, মন তাঁদের মুহুর্মুহু লোক থেকে লোকোত্তরে যাওয়া-আসা করছে। সে ক্ষেত্রে তাঁদের ভাবাবেগ যে ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, তার সঙ্গতি আর কবি চু ইউয়ানের ভাবাবেগ প্রকাশের সঙ্গতি তুলনা করলে শেষোক্ত আবেগ প্রকাশকেই বেশি স্বাভাবিক বলা চলে।

কুয়ো মো-জো অন্যত্র কবির মুখে এবং সকল পাত্রপাত্রীর মুখে যে ভাষা দিয়েছেন, তা যেমন সরস তেমনই সরল ও সার্থক। তাতে নাটুকেপনা এতটুকুও নেই অথচ নাটকের চরিত্রগুলি সহজভাবে গড়ে তুলেছে এবং নাটকে রস সঞ্চার করছে।

নাটকের রাণী ছলনাময়ী এবং চু ইউয়ানের জীবন ব্যর্থ করে দেবার প্রধানা ষড়যন্ত্রকারিণী। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যেন তার ওপর ঘৃণা হয়না, মনে হয় অমন বুদ্ধিমতী নারী অত খারাপ কেনই বা হোলো? নাট্যকার এই প্রশ্ন ওঠবার অবসর দিয়েছেন। যদি এইজন্য দিয়ে থাকেন যে, ওই প্রশ্ন উঠলেই পরিবেশের প্রশ্ন উঠবেই, তাহলে এই নারী চরিত্রকেও নিশ্চিতই একটি সৃষ্টি বলা যেতে পারে। চ্যান-চুয়ান চরিত্রটি আর একটি মধুর চরিত্র যা নাটকে চিত্তগ্রাহী করা হয়েছে। কিন্তু কুয়ো মো-জো তাকে হত্যা করলেন কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে? চ্যান-চুয়ান যদি গুরুকে বাঁচাবার জন্য বিষ পান করত, তাহলে তার এই মৃত্যুকে হত্যা বলতাম না, আত্মদান বলতাম। কিন্তু যে বিষের অস্তিত্ব সেখানে উপস্থিত কোন লোক জানত না, সে বিষ নাটকের কোন প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্য চ্যান-চুয়ান হত্যায় প্রযুক্ত হোলো? অবশ্য এ যুক্তি দেওয়া যায় যে, চ্যান চুয়ান যদি-না ওই বিষ পান করত, তাহলে

হয়ত চু ইউয়ান কখনো তা পান করে ফেলতেন। হয়ত সেই কারণেই নাটকে রয়েছে চু ইউয়ান চ্যান চুয়ানকে কেবলই কন্যা বলে, শিষ্যা বলে তৃপ্ত হচ্ছেন না—পরম হিতকারিণী বলেও অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

কিন্তু তা যেমন জানাচ্ছেন, তেমন চ্যান চুয়ানের মৃত্যুর নিমিত্তভাগী হলেন বলে কোথাও তো ক্ষোভ প্রকাশ করছেন না? অথচ তিনিই অনুমান করেন চ্যান চুয়ান তৃষ্ণাকাতরা, বিষাক্ত পানীয়ের পেয়ালা তিনিই চ্যান চুয়ানের অধরে তুলে ধরেন। বিষের জ্বালায় চ্যান চুয়ান যখন ছটফট করতে থাকে, তখন চু ইউয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করেন—"বড্ড কষ্ট হচ্ছে চ্যান চুয়ান?"

চ্যান চুয়ান বলে—"ওই মদ...প্রভু...ওই মদ...বিষাক্ত। আমার মৃত্যু তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে, বড় ভাগ্যবতী আমি।"

চ্যান চুয়ানের পক্ষে এ-কথা বলা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মানবদরদী চু ইউয়ান যে একটিবারও নিজেকে নিমিত্তভাগী ভেবে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না, এইটেই আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। তিনি যে একেবারে বজ্রাহত আড়ষ্ট আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন, নাটকে তাও কোথাও পেলাম না—শুধু জানলাম তিনি অকৃতজ্ঞ নন। কিন্তু ওইটুকুই কি যথেষ্ট?

কারপর, মৃত্যুর পূর্বে চ্যান চুয়ান যে কথাগুলি বলছে, তাও যেন জোর করেই তার মুখে দেওয়া হয়েছে। সে যে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে রেখেছিল, নাটকে আর কোথাও তো তার কোনই পরিচয় পাইনি। গোড়া থেকে তাকে বুদ্ধিমতী প্রভুভক্তিপরায়ণা পরিচারিকা রূপেই দেখে এসেছি। বিষপানের ঘটনার পরই কেবল জানতে পারলাম সে তার মাতৃভূমিকে এমন গভীরভাবে ভালোবাসে যে, মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে সে সর্বদাই প্রস্তুত ছিল—মাতৃভূমিকে ভালোবাসে বলেই সে চু ইউয়ানকে ভালোবসেছিল।

এতবড় উক্তিটি সার্থক করে তুলতে হলে চরিত্রটিকে গোড়া থেকেই গড়ে তোলা উচিত ছিল। কিন্তু নাটকে তা করা হয়নি। আর তা করা হয়নি বলেই চ্যান চুয়ানের শেষ কথাগুলি নাট্যকারেরই কথা হয়েছে। চ্যান চুয়ানের মৃত্যুর পুর্বক্ষণ পর্যন্ত নাটক চলেছিল তার নিজস্ব গতি নিয়ে। কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকেই নাটকের চেয়ে নাট্যকার বড় হয়ে উঠেছেন বলে মনে হোলো। এর পর থেকেই মনে হয় নাট্যকারের আর কোনো কবি আর কোনো স্বদেশ-প্রেমিক মুক্তিকাম প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। চু ইউয়ানের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে যে প্রতিহার, সে বলছে—"প্রভু, আমাদের দেশের পক্ষে অপরিহার্য তুমি, চীনের পক্ষে অপরিহার্য তুমি। এখানে তোমার জীবন বিপন্ন। এখানে তুমি থেকো না। আমি হ্বান নদীর উত্তর অঞ্চলের লোক। তোমাকে আমি সেইখানে নিয়ে যেতে চাই। আমরা উত্তর অঞ্চলের জনসাধারণ সকলেই তোমার অনুরাগী, তোমার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। সত্য আর সরলতার প্রতি আমাদের আন্তরিক টান। দেশরক্ষার জন্য বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। প্রভু, উত্তর অঞ্চলের লোক আমরা যেমন করে আমাদের নয়ন রক্ষা করি, তেমন করেই আমাদের স্বদেশ-আত্মা তোমাকেও বাঁচিয়ে রাখব।"

এর জবাবে নাট্যকার চু ইউয়ানকে দিয়ে বলিয়েছেন—"বেশ, তোমার কথা মতোই আমি কাজ করব। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমি আমার মাতৃভূমিকে রক্ষা করব, রক্ষা করব আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে হ্বান নদীর উত্তরাঞ্চলের জনগণের স্বাধীনতা।"

যে চু ইউয়ানের জীবন নিয়ে এই নাটক রচিত হয়েছিল, সে চু ইউয়ানের অন্তিম প্রস্থানে এ দৃঢ়তা ছিল না, নাট্যকার লিখিত কবির জীবনী থেকেই আমরা তা জেনেছি। রাজনৈতিক হিসেবে তিনি

ব্যর্থতাই বহন করেছেন—জীবনবৃত্তান্তে নাট্যকারই আমাদের শুনিয়েছেন। বিশ বছর নিরুদ্দিষ্ট থেকে চু ইউয়ান হতাশায় ভেঙে পড়ে নদীর জলে আত্ম-বিসর্জন করেছিলেন। কিন্তু নাটকে যে চু ইউয়ানকে পাই, তাঁকে ব্যর্থ রাজনীতিক মনে করা যায় না। তাঁর কথা শুনে মনে হয় না হতাশায় ভেঙে পড়বার পাত্র তিনি। তাই মনে হয় ১৯৪২ সালে খৃষ্টপূর্ব ৩৪০ সালের চু ইউয়ানকে নাটকে রূপায়িত করতে প্রবৃত্ত হয়ে রচনাকালের সমসাময়িক প্রভাব দ্বারা নাট্যকার প্রভাবান্বিত হয়েছেন, অথবা ইচ্ছাপূর্বক তিনি অতীতের চু ইউয়ানকে কিছু নতুন রঙ মাখিয়েছেন। চু ইউয়ান চীনের মুক্তিসংগ্রামের দিনে রচিত। মুক্তির পর নয়া চীনের নতুন নাটক দেখবার বা পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। Budha's coin গল্পটি Registration নামে মুক্তির পরে প্রকাশিত হয়েছে। হয়ত তার নাট্যরূপও দেওয়া হয়েছে আধুনিক কালেই; অর্থাৎ মুক্তির পরেই। কেবলমাত্র সমাপ্তির মুখে ছাড়া তু'খানি নাটকই রসোত্তীর্ণ। সমাপ্তিকালে তুখানিই প্রচারণায় ভারাক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তাও করা হয়েছে জাতির প্রয়োজনে। ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রয়েছে বলেই প্রচারণা বলছি না; নাটকে তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যে ভাষায় সেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, সেই ভাষাই প্রচারণাকে প্রবলতর করেছে। তারও প্রয়োজন চীনে এখন রয়েছে। চীন মেনে নিয়েছে নাটকত্বের জন্যই নাটক রচনার ও পরিবেশনার চেয়ে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই নাটকের প্রয়োজন বেশি। চীন তাই প্রচারণা পরিহার করতে চায়না, যদিচ সেই প্রচারণাকে কলা-সম্মত করবার প্রয়াসের পরিচয় তার নাট্যসৃষ্টিতে পাওয়া যায়।

সমবেত নাচগান

চীন-প্রবাস কালে পাঁচটি শহরে অন্তত পঞ্চাশটি সমবেত নাচগান দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। অপূর্ব তাদের আবেদন। সে আবেদন লিখে বোঝানো আমার পক্ষে শক্ত। বিদেশী সুরের কোথায় কি বৈশিষ্ট্য, তাল-লয়ে আমাদের থেকে কতটা পৃথক, এ-সব কথা বলতে আমি অসমর্থ। আমাদের শিল্পীরা বলেছেন চীনের ক্লাসিকাল সঙ্গীতে আমাদের পাঁচটি রাগের এবং দুটি তালের সমতা তাঁরা লক্ষ্য করেছেন। ওঁদের মাঝে কেউ কেউ হয়ত ও-সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলতে পারেন।

সমবেত গান নানা ধরনের শুনেছি আমরা। তার মাঝে যেমন ক্লাসিকাল গান আছে, তেমন লোক-সঙ্গীত আছে, আবার তেমনই আছে আধুনিক গান। ক্লাসিকাল এবং লোক-সঙ্গীতে বিদেশী সুর এবং যন্ত্র প্রযুক্ত হয়না। আধুনিক গানে দুই-ই প্রযুক্ত হয়। ত্রিশ-চল্লিশটা বেহালা, টেনর, চেলো, গীটার, পিয়ানো ব্যবহৃত হয় এবং সুরেও ইটালিয়ান আমেরিকান সুরের প্রভাব পাওয়া যায়। আধুনিক সমবেত সঙ্গীত যেমন দেশের আভ্যন্তরীণ কর্মীদেরকে কর্মে অনু-প্রাণিত করবার জন্ত গাওয়া হয়, তেমনই গাওয়া হয় কোরিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। কাজেই এই সব সমবেত সঙ্গীতকে অনেকটা সামরিক সঙ্গীতের পর্যায়েই ফেলা চলে। পিকিংয়ের এক সমাবেশে দুটি

সমবেত সঙ্গীত শুনেছি যাতে অংশগ্রহণ করেছেন নব্বই জন গায়ক ও বাদক। দেখেছি, এই নব্বইটি নর-নারীর একশ-আশিটি চোখ সর্বদাই নিবদ্ধ রয়েছে ডিরেক্টার-কনডাক্টরের হাতের ওপর। দেখতে দেখতে মনে হয়েছে নব্বইটি লোক যেন একটি যন্ত্রেরই পৃথক পৃথক অংশ। স্বর সাধনার বিশিষ্ট পরিচয়ও অবশ্য এতে পাওয়া যায়। সমবেত গানের এই অর্কেষ্ট্রশন আশু ফলপ্রদ—শ্রোতৃদেরকে সহজেই অনুপ্রাণিত করে। যে উদ্দেশ্যে এইসব গান রচিত ও গীত হয়, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্পূর্ণ সহায়তা করে।

বছর দুই আগে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সদস্যদেরকে আমি বলেছিলাম, তাদের সমবেত নাচ-গানগুলি তেমন সার্থক হতে পারছে না কণ্ঠের ও যন্ত্রের অপ্রাচুর্যে। সমবেত নাচ গানের-জন্য যেমন বেশি লোক চাই, তেমন যন্ত্রও চাই বেশি, সুরেরও চাই উন্মাদনা। কেবলমাত্র একটি হারমোনিয়ামের সহায়তায় সমবেত সঙ্গীত তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারেনা। সদস্যরা এ নিয়ে আলোচনা করেন। বোম্বাই সম্মেলনেও আলোচনা হয়। একদল বলেন, বিদেশী সুরের এবং বিদেশী যন্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই। আর এক দল বলেন, হলে ভালো হয়। বিদেশী সুর গণনাট্য সঙ্ঘ বর্জন করে চলেন না। কিন্তু সেই সুরকে হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য কিছু কিছু বিদেশী যন্ত্রও চাই। আমাদের পালা কীর্তনে-অথবা যাত্রা-অপেরায় এবং আমাদের থিয়েটারে বিদেশী যন্ত্র ব্যবহৃত হয়—বেহালা তো সর্বত্র। হারমোনিয়াম স্বদেশী নয়। গণনাট্য সম্প্রদায়ের পাঁচ-ছয়টি গায়ক-গায়িকা একটি হারমোনিয়ামকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যে সমবেত-সঙ্গীত পরিবেশন করেন, তা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে। শ্রোতৃরা গানের চেয়ে গানের কথাকেই বেশি মূল্যবান মনে করেন। গণ-নাট্য সঙ্ঘের সদস্যরা মাইকের সাহায্য না নিয়ে সমবেত সঙ্গীত গাইতেও

রাজি হন না। নয়া চীনে কোন সমবেত সঙ্গীত মাইকের সাহায্যে পরিবেশন করতে শুনিনি। সেখানে যাঁরা সমবেত সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁরা যে রীতিমত স্বর সাধনাও করেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে পরিচয় আমাদের সমবেত সঙ্গীতে খুবই অল্প ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। বিদেশী যন্ত্র-সঙ্গীত ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে হলে দীর্ঘকালের সাধনা চাই। আমাদের পালা-কীর্ত্তনে অথবা পালা-যাত্রায় অথবা থিয়েটারে যাঁরা বেহালা বাজান তাঁরা দীর্ঘকাল সাধনা করেন। অবশ্য সকলেই তা করেন ব্যক্তিগত ভাবে। সমষ্টিগত-ভাবে বহুলোক সাধনা করতে পারেন এমন ক্ষেত্র অথবা প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে বিরল। সাময়িক তাগিদে যেসব সঙ্গীত বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, সেগুলি যথেষ্ট নয়। গণনাট্য সঙ্ঘের এমন অর্থ নেই যে এইরূপ একটা সাধনার ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে পারে। শুধু অর্থই চাই না, সাধনার সঙ্কল্পও চাই। কিন্তু গণনাট্য সঙ্ঘের মতো প্রতিষ্ঠান সমূহে যে-সব ছেলে-মেয়ে যোগদান করেন, সঙ্ঘে তাঁদের অবস্থিতি একান্তই সাময়িক। জীবিকা অর্জন করবার দায়িত্ব যখন তাঁদের ওপর পড়ে, তখন তাঁদেরকে অন্যত্র সরে যেতে হয় এবং নেহাৎ দলানুগত্যের জন্য অবসরকালে তাঁরা গণ-নাট্যের আসরে উপস্থিত হন। তাদের সমবেত গান আর নাচে তখন আর সমবায়ের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে স্কুল কলেজে নাচ-গান শেখাবার কোন ব্যবস্থা নেই, তরুণ-তরুণীদের দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রেও নয়। সঙ্গীত বিদ্যালয় দেশে যা আছে, তা একান্তই শিক্ষালয়; জাতির জীবনের সঙ্গে, প্রয়োজনের সঙ্গে, সংস্রব রেখে সেগুলি চলে না। স্কুল কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালকরা নাচগানকে উপদ্রবই মনে করেন। আজকাল অবশ্য উপদ্রবটা অপরিহার্য মনে করে সয়ে যাচ্ছেন। শান্তিনিকেতন

পিকিং অপেরার শিল্পী



হ্যানচৌয়ের অভিনয় অনুষ্ঠানের দৃশ্য



রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা-ভোজ
[প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই দণ্ডায়মান অবস্থায়]



ক্যাণ্টনে সমবেত ভারতীয় প্রতিনিধিদল ও চীনা শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দ

গুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছেন। সেখানে কাজও হচ্ছে ভালো। আমাদের ফ্যাক্টরি প্রভৃতিতে কর্মীদের জন্ত ওসবের কোন আয়োজন থাকেনা।

নয়া চীনের স্কুলে কলেজে বিশ্ববিত্তালয়ে ও-সব চর্চায় প্রচুর সুযোগ দেওয়া হয়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তা হয়। পিপল্‌স্ রিপাবলিক-গুলির ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ এ-বিষয়ে বহু দায়িত্ব বহন করে। তাই সমাজের সর্বস্তরেই সমবেত নাচ-গান সাধনার ক্ষেত্র পাওয়া যায়। সমবেত নাচ-গান ব্যক্তির কৃতিত্বে সার্থক হয় না, সহযোগিতার ও সুশৃঙ্খলার এবং সংযমের ও নিয়মানুবর্তিতার অপেক্ষাও রাখে। কাজেই এই সমবেত নাচগান অভ্যাসের ফলে কেবল যে সঙ্গীতে ও নৃত্যেই পারদর্শিতা জন্মে তা নয়—সমাজ-জীবনে নানা ক্ষেত্রেও তার সুফল পাওয়া যায়।

নয়া-চীনে যে সব সমবেত গান শুনে এসেছি, তাদের কয়েকটির বিবরণ নীচে দিচ্ছি এই ভেবে যে, তা থেকে গানের ধারা কতকটা বোঝা যাবে।

: বড় সুন্দর আমাদের সাও ইয়াঙ গাঁ

আধুনিক গান। সাও ইয়াঙ গ্রামটি শ্রমিকদের জন্ত গড়া নতুন গ্রাম। এক হাজার দুইটি গৃহহীন শ্রমিক পরিবারের বাসোপযোগী গৃহ এই গাঁয়ে তৈরী হয়েছে। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুরই ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। এই গাঁয়ে যে শ্রমিকরা বাস করে তারা জানে, তারা কারো দাস নয়, কারো বোঝা বইবার ভারবাহী জীব নয়, আত্ম-কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অধিকারী তারা। এ গাঁ তাদের নিজেদেরই গাঁ। তাদেরই শ্রমের ফল সুন্দর এই সাও ইয়াঙ

গাঁ। গানটি রচনা করেছেন এবং স্বরও দিয়েছেন ওয়াঙ উয়ি-স্থান নামক একজন শ্রমিক।

ঃ বীরত্বে বশীভূত তাই-তু নদ

জনগণের মুক্তিফৌজ শৌর্যে অপরাজেয়। এমন কোন প্রতিবন্ধক নেই যা তারা উত্তীর্ণ হতে পারে না। এই অপরাজেয় বাহিনী বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দুস্তর তাই-তু নদ পার হয়ে জনগণকে কি.ভাবে মুক্ত করেছিল, গানে তাই বর্ণিত হয়েছে।

ঃ যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ-দস্যু ভূতলে পতিত

যুদ্ধবাজরা কোরিয়ায় সমরানল জ্বালিয়ে তুলেছে। তারা বোমা ফেলে নারী হত্যা করছে, শিশু-হত্যা করছে, শান্তিকাম নিরস্ত্র অধিবাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। চাইনিজ পিপ্‌ল্‌স্‌ ভলান্টিয়ার্স শান্তিরক্ষার জন্য, মানুষের জীবন রক্ষার জন্য কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রের বদলে অস্ত্র ছেনে শত্রুকে হটিয়ে দিচ্ছে, আকাশ থেকে যারা বোমা বর্ষণ করছে তাদেরকে ভূমিতলে ফেলে দিচ্ছে। গানটি রচনা করেছেন পিপ্‌ল্‌স্‌ ভলান্টিয়ার্স নিজেরা।

ঃ বীর মোটরচালক দল

পিপ্‌ল্‌স্‌ ভলান্টিয়ার আর্মির মোটরচালকরা কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে কী বিস্ময়কর বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সৈন্য ও সমর-সম্ভার সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রেখেছে তারই বর্ণনা।

ঃ ইয়োলো নদ প্রশস্তি

মহান ও মোহন ইয়োলো নদ জাতিকে কিভাবে বীরত্বে ও সম্পদে গরীয়ান করে তুলছে তারই এমন বর্ণনা যে জাপানী যুদ্ধের সময় চীনের

মুক্তি-ফৌজ এই গান থেকে প্রেরণা পেত। স্বদেশী যুগে আমরাও 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' এবং 'যমুনা, এই কি তুমি সেই যমুনা-প্রবাহিনী' গান থেকে দেশপ্রীতির প্রেরণা পেতাম।

রচনার দিক দিয়ে এবং সুরের দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুলের গান চীনে-শোনা সমবেত গানগুলির চেয়ে নিশ্চিতই শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু যন্ত্র-সঙ্গীতের সহায়তায় এবং গায়কদের সমবেত প্রয়াসের ফলে চীনের এই গানগুলি বেশি উদ্দীপনা সঞ্চারে সক্ষম। আমাদের শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের গান গেয়েছিলেন। শ্রোতৃরা খুশিও হয়েছিলেন। যদি চীনের পদ্ধতি অনুসারে ওই গানগুলি গাওয়া সম্ভব হোতো, তা হলে তা বেশি ফলপ্রদ হোতো। হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ও সুর-সংযোজিত 'হিন্দি-চীনী ভাই ভাই' সুরের ও সমবায়ের ফলে সর্বত্র সমাদর লাভ করেছিল।

চীনের লোকসঙ্গীতগুলি কিন্তু আধুনিক সঙ্গীতের চেয়ে কাব্য সম্পদে ও জীবন-রসে অধিকতর সম্পাদশালী বলে মনে হয়েছে। কয়েকটি লোক-সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া গেল।

ঃ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ডালিমে লালিমা

মিয়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন লোক-সঙ্গীত অবলম্বনে নবভাবে রচিত। মিয়াও সম্প্রদায় বৃহত্তর চীন জনগণের সম-অধিকার লাভ করে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলেখ্য দেখে চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছে।

ঃ জলচক্রের গান

সি-সুয়েন লোক-সঙ্গীত। গ্রীষ্মকালে ক্ষেতে জল দেবার জন্য

জল-চক্র চালাতে চালাতে কৃষকরা ফসল পাবার পরবর্তী সময়ের সুখ-স্বস্তি সম্বন্ধে যে কল্পনা করে, তাই নিয়ে রচিত এই গান।

ঃ প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী

ইউনান প্রদেশের লোক-সঙ্গীত। প্রণয়-গীতি। জ্যোৎস্না-প্লাবিতা ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর তীরে বসে তরুণী প্রিয়তমকে আহ্বান করছে।

ঃ মহান্ মাও সে-তুঙ

সিংকিয়াং প্রদেশের আধুনিক লোক-সঙ্গীত। এই গানে বর্ণনা করা হয়েছে যে চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সিংকিয়াংয়ের লোকরা কেমন ফুলের মতো ফুটে উঠছে। গায়কদের কণ্ঠ থেকে যেন কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ে।

চীনের সমবেত লোক-সঙ্গীত তার আধুনিক লোক-সঙ্গীতের চেয়ে অধিকতর কাব্যময় ও প্রাণময় এবং তাতে অনুকৃতি বা কৃত্রিমতা নেই। এ থেকে জনমনের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় এবং বোঝা যায় কেন দু'হাজার বছরের প্রতিটি বছরে চীনের জনগণ জনপ্রেমিক মহাকবি চু-ইউয়ানের তিরোধান-তিথিকে স্মৃতি উৎসবের দ্বারা সঞ্জীবিত রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমাদেরও বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোক-সঙ্গীত কাব্যে ও জীবনাদর্শে এবং পরিব্যাপ্তিতে আধুনিক গানের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। আমাদের বাউলরাও মেলা করে তাঁদের গুরুর স্মৃতি-তর্পণ করে থাকেন।

নয়া চীনের সমবেত নৃত্যগুলি খুবই মনোরম। তাতে রূপ রস রঙ একটানা স্রোতের মতো বয়েই চলে; জীবন-রসে উচ্ছল তা। উইগার লোক-নৃত্য 'প্রফুল্ল প্রাণ', ফুকিন লোক-নৃত্য 'চায়ের পাতা তোলা দীপালী', দি সেন্ট্রাল এক্সপেরিমেন্টাল ইনস্টিটিউটে অব সং

য়্যাণ্ড ড্রামার "ফুল ও প্রদীপ', ইস্ট চায়না পিপ্‌লস্‌ একাডেমি অব আর্ট য়্যাণ্ড ড্রামার 'অসি নৃত্য', 'কোরিয়ান নৃত্য', 'সিংকিয়াঙ নৃত্য' এবং আরো নানা স্থানে দেখা বহু লোক-নৃত্য আমাদের মনকে নাচাতে সক্ষম হয়েছে। যতগুলি নৃত্য আমরা দেখেছি, সবই গল্পসমন্বিত নৃত্যাভিনয়, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরপুর। কলা হিসেবে আমাদের সর্বপ্রকার নৃত্যকে চীনে-দেখা নৃত্যগুলির চেয়ে অনেক উন্নত বলতে আমার কোনই সঙ্কোচ হয় না। কিন্তু প্রাণাবেগ সম্বন্ধে সে-কথা অসঙ্কোচে বলতে পারি না। চীনের সমবেত নৃত্য-গীতে প্রকাশিত জাতির স্বতস্ফূর্ত যে প্রাণাবেগের পরিচয় পেয়েছি আমাদের আধুনিক সমবেত নৃত্য-গীতে সে পরিচয় পাই না। চীনের নৃত্য-গীতের রচয়িতারা, সুর-স্রষ্টারা, নাচিয়েরা এবং গাইয়েরা ভবিষ্যতকে যেন রামধনুর সপ্তবর্ণে রঞ্জিত দেখে বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে অগ্রগামী হয়েছেন নৃত্য-গীতের ঐশ্বর্য সম্ভার নিয়ে। নাচিয়ে-গাইয়েদের মনস্তত্ত্বের অনেকটা পরিচয় তাঁদের নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনার ধরন থেকে বোঝা যায়। ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, সে সম্বন্ধে তাঁদের মনের কোথাও বিন্দুমাত্র সংশয়ই যেন নেই। বাহির থেকে নির্দেশ দিয়ে এই সংশয়হীন বিশ্বাস জাগ্রত করা যায় না। ও যেন সত্যি সত্যিই রবীন্দ্রকল্পিত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েক দিক

তিনজিন পলিটেকনিক দেখতে গিয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়টি জাতির মুক্তিলাভের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্রসংখ্যা সাড়ে তিন হাজার, অধ্যাপক ও শিক্ষকের সংখ্যা চারশত ছাপ্পান্ন। নয়টি বিষয় এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়—(১) ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, (২) রেডিও এঞ্জিনিয়ারিং, (৩) কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, (৪) হাইড্রো ইলেকট্রিকস, (৫) সেচ, (৬) বাড়ী-ঘর তৈরি, (৭) বয়ন, (৮) রাস্তা তৈরি, (৯) বিমান-বিদ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-ডিরেক্টর প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বর্ণনা করতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"এতগুলি বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় কোন ভাষার মাধ্যমে?"

—"মাতৃভাষার" ডিরেক্টর জবাব দিলেন।

আমি বল্লাম—"আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা মনে করেন আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায় না।"

—"আমরাও দেশমুক্তির আগে তাই বলতাম।"

—"মুক্তির পর মাত্র এই তিন বছরেই কি সব পাঠ্য-পুস্তক তর্জমা করা হয়েছে?"

—"সে তো অসম্ভব।"

—"তবে?"

—"আসল কথা আমরা ছাত্রদেরকে পাঠ্য-পুস্তকের ওপর নির্ভরশীল করে রাখিনা।"

—"তবে তারা পড়ে কি ?"

—"তারা পড়ে কম, শেখে বেশি।"

—"মাপ করবেন, বুঝতে পারছিনা।"

—"বুঝতে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বুঝতে হবে।"

—"দয়া করে তাই বুঝিয়ে দেবেন ?"

—"দেখুন, আমরা বিত্তের বোঝা চাপিয়ে দেবার জন্যই ছেলে-মেয়েদের পড়াই না। পড়াই তাদেরকে কাজের জন্য তৈরি করে দিতে। আমাদের এখানে নিয়ত খবর আসে দেশের কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ এঞ্জিনিয়ারিং কাজ হচ্ছে, কী ধরনের কাজ হচ্ছে, ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা কি, কত কর্মীর প্রয়োজন। সেই সব জেনে নিয়ে আমরা সিলেবাস তৈরি করবার কথা ভাবি। কোন্ কাজের জন্য যোগ্য কর্মী তৈরি করতে কতখানি কি শেখাতে হবে আমরা অধ্যাপকরা আর শিক্ষকরা তাই আলোচনা করে স্থির করি। তারপর প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদেরকে আমরা লেকচার তৈরি করতে বলি। তাঁরা তাই তৈরি করেন, ছাত্রদের কর্মজীবনে কি কি কাজ করতে হবে, সেই দিকে দৃষ্টি রেখে। সেই লেকচারগুলি তৈরি হবার পর সেগুলি সকল বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সামনে পড়া হয়। তা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনা থেকে বোঝা যায় ত্রুটি বিচ্যুতি কোথায় কি রয়েছে। প্রয়োজন মতো অদল-বদল করা হয়। সেই লেকচারগুলিই হয় আমাদের পড়াবার বিষয়। বিভিন্ন বিষয়ের ছাত্রদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রচিত সেই লেকচারগুলি পড়িয়ে দেওয়া হয় মাতৃভাষার সাহায্যে। আমাদের অধ্যাপকদের মাঝে নানা ইউরোপীয় ভাষায় অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী আছেন। তত্ত্ব এবং তথ্য

তাঁরাই সংগ্রহ করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সব কিছু তাঁরা মাতৃভাষার সাহায্যে বুঝিয়ে দেন। কেবল এইখানেই আমরা শিক্ষা দিইনা, বছরে নির্দিষ্টকাল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-হাতুড়িতে কাজ শেখবার জন্য আমরা ফ্যাক্টরিতে রাখি, কন্‌ষ্ট্রাকসন যেখানে হচ্ছে সেইখানে পাঠিয়ে দি। সকল রকম প্র্যাকটিকাল কাজ তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটারিতে ওয়ার্কশপে শেখানো সম্ভবপর হয় না। ফ্যাক্টরি প্রভৃতিতে পাঠিয়ে প্র্যাকটিকাল কাজ শেখানো আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। এতে দুটো লাভ হয়। প্রথমত ছেলে-মেয়ের হাতে-হাতুড়ীতে কাজ শেখা ফ্যাক্টরি বা কন্‌ষ্ট্রাকশনের প্রয়োজন মতো হয়, দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। আমাদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা শেষ করে কাজে ঢোকবার পর যদি তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে রিপোর্ট আসে যে, তারা কাজ ভালো চালাতে পারছেনা, তাহলে আবার তাদেরকে কিছুদিন ইউনির্ভাসিটিতে এনে পড়িয়ে দেওয়া হয়। অম্নিই আমাদের সকল ফ্যাক্টরির মডেল আদর্শ শ্রমিকদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাবার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের এখানেও তাদের শিক্ষা দেবার ক্লাশ আছে। পিপ্‌লস্‌ ইউনিভার্সিটি ওদেরই শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের যেখানে যখন যেমন কাজ হয়, আমাদের সিলেবাসও তেমন তেমন পরিবর্তিত হয়। একেই আমরা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা এডুকেশন বলি।”

জিজ্ঞাসা করলাম—“বছর বছর যত ছেলে-মেয়ে আপনারা বার করে দেবেন, সবাই কাজ পাবে?”

—“পুনর্গঠনের কাজ যদি বন্ধ না হয়, শিল্পায়ন যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হয়, তাহলে আমাদের কোন গ্রাজুয়েটের বেকার থাকবার কথা নয়। কর্মীর চাহিদা এত বেশি যে, এখন আমাদের

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যা আছে, সামনের সেশনে তার সংখ্যা দাঁড়াবে তার দ্বিগুণ। শিক্ষা শেষ করে কেউ বেকার থাকবে না।"

আমি বলাম—"এ তো বল্লেন কাজ চালাবার মতো শিক্ষার ব্যবস্থা।"

—"হ্যাঁ, তাই তো বল্লাম। এইটেই ত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা। দেশকে বড় করতে হলে জাতির শিল্প-প্রয়াসকে সফল করতে হবে। তা করতে হলে শিক্ষিত কর্মীর যোগান দিতে হবে। জাতীয় শিক্ষার কাজই তাই।"

—"কিন্তু বিজ্ঞান-গবেষণা?" জানতে চাইলাম।

—"তার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দেশে আছে। সকল ছাত্র-ছাত্রীই কিছু গবেষণার কাজে আত্ম-নিয়োগ করবার অধিকারী নয়—অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই তা নয়। অধিকাংশ কর্মীই হবে। তাই সুদক্ষ কর্মীই যাতে তারা হতে পারে, তারই ব্যবস্থা আমরা করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েশন আছে, কিন্তু ডিগ্রী নেই। ডিগ্রীর দোষ হচ্ছে, ডিগ্রীই শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, শিক্ষা অধিকাংশের কাছে হয়ে থাকে উপলক্ষ্য। আমরা প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও তাদের সম্ভাবনা তাদের কাজ দেখে স্থির করি, ডিগ্রী দেখে নয়। যখন বুঝতে পারি কোন ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ গবেষণা করবার অধিকারী, তখন তার শিক্ষার ব্যবস্থা স্বতন্ত্রভাবে করি। তা-ছাড়া আমাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা কাজ করতে করতেই যে গবেষণা করে, তা আমাদের আদর্শ-শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি যদি লক্ষ্য করেন, তা হলেই আপনারা তা বুঝতে পারবেন।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভাইস-ডিরেক্টর প্রায় একঘণ্টাকাল আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে তাদের শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। তারপর আরো একঘণ্টাকাল আমরা ঘুরে ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ দেখে নিলাম, অধ্যাপকরা

সঙ্গে থেকে আমাদের সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁরা জানতেন আমরা বিজ্ঞানী নই—নাচিয়ে-গাইয়ে-নাটুকে দল। কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা বোঝাতে তাঁদের উৎসাহের অভাব দেখা গেল না। দেশের নানা কন্‌ষ্ট্রাকশনের মডেল প্রতি বিভাগে প্রচুর দেখতে পেলাম। সেগুলি তাঁরা আমাদের এমন সরলভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, হাইড্রো ইলেকট্রিকের মোটা কথাগুলো অতি সহজেই আমাদের জানা হয়ে গেল। এই বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ল কোয়ানতিঙ রিজার্ভয়ার দেখবার সময়কার কয়েকটি বিশেষ বিষয়।

পিকিং থাকবার সময় একটি দিন আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। একবেলায় দেখেছিলাম কোয়ানতিঙ রিজার্ভয়ার আর এক বেলায় 'দি গ্রেট ওয়াল'-এর একটি অংশ। কোয়ানতিঙ রিজার্ভয়ারটি ঘুরে-ঘুরে দেখতে চার ঘণ্টা সময় আমাদের লেগেছিল। ভাইস-ডিরেক্টর আর চীফ-এঞ্জিনিয়ার আমাদের সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সেখানে দেখলাম তরুণ-তরুণী এঞ্জিনিয়াররা নানা বিভাগে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। কর্মীর সংখ্যা শুনলাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার। দিবা-রাত্রি কাজ চলে। চীনে যেখানে যে প্রতিষ্ঠানই দেখতে গেছি, সর্বত্রই দুটি করে আলোচনা বৈঠকে বসতে হয়েছে। প্রথমেই অভ্যর্থনা করে একটি বৈঠকে বসিয়ে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস শোনানো হয়, কী কাজ কেমন করে করা হয় তাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি দেখে যে-সব প্রশ্ন মনে উদিত হয় তার জবাব দেবার জন্য আর একটি বৈঠক বসে। দুটি বৈঠকেই পানাহারের ব্যবস্থা থাকে—নানাবিধ ঠাণ্ডা পানীয় এবং রকমারি ফল।

কোয়ানতিঙ রিজার্ভয়ার পরিক্রমা শেষ করে বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রথমেই আমি বললাম—"এই ধরনের কাজ চীনে নতুন হচ্ছে, অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য তেমন কিছু আছে কি ?"

ভাইস-ডিরেক্টর শোনালেন—"বন্যার উপদ্রব চীনে চিরন্তন। বন্যা রোধ করবার প্রয়াস প্রাচীন আমল থেকেই চলে আসছে। মিউজিয়ামে নানা প্রাচীন চিত্রে তার পরিচয় আপনারা দেখে থাকবেন।"

লজ্জিত হলাম। সত্যিই তো মিউজিয়ামে সে-রকম চিত্র অনেকগুলি দেখেছি। সে-কথা স্বীকার করলাম।

ভাইস-ডিরেক্টর হেসে বল্লেন—"কাজেই বুঝতে পারছেন অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য যে একেবারেই নেই, তা সত্য নয়। তবে হ্যাঁ, এই ধরনের বাঁধ তৈরি করবার অভিজ্ঞতা ছিলনা। কিন্তু প্রশ্নটা আপনার মনে উঠেছে কেন জানতে পারি কি ?"

আমি বল্লাম—"কোথাও একটিও বিদেশী এঞ্জিনিয়ার দেখতে পেলাম না কিনা।"

তিনি বল্লেন—"বিশেষ করে এই পরিকল্পনাটির ব্লু-প্রিণ্ট সোবিয়েত অভিজ্ঞদেব দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়েছে। কাজ যখন শুরু হয় তখন তাঁদের উপস্থিতিতেই শুভারম্ভ। এখন আমাদেরই তরুণ ও প্রবীণ এঞ্জিনিয়াররা কাজ করে যাচ্ছেন। মাঝে-মাঝে এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যা আমরা সমাধান করতে পারিনা। তখন আমরা সোবিয়েত এঞ্জিনিয়ারদের শরণাপন্ন হই। তাঁরা এসে সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যান এবং আমাদের এঞ্জিনিয়ারদের বুঝিয়ে দিয়ে যান ভবিষ্যতে আর কোন্ কোন্ সমস্যার উদ্ভব হতে পাবে এবং হলে, তার সমাধান সম্বন্ধেও নির্দেশ দিয়ে যান। আমরা আমাদের এঞ্জিনিয়ারদেরকে এই একটি কাজের ভিতর দিয়েই বিশেষজ্ঞ করে তুলতে চাই বলেই তাঁদেরকে একেবারে পরনির্ভরশীল করে রাখতে চাই না। সোবিয়েত যখন সাহায্য করবার আগ্রহ নিয়ে আমাদের পাশেই রয়েছেন, তখন আমাদের অযথা উদ্বিগ্ন হবার কারণ কি ?

আমাদের এঞ্জিনিয়াররা কিছু কিছু ভুল করতে করতেই কাজে ওস্তাদ হয়ে উঠুন, তাই আমরা চাই। একমাত্র হেভি ইন্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্র ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্রে বিদেশী বিশেষজ্ঞকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত রাখা হয়না। আর আমাদের সকল পরিকল্পনাও কিছু সোবিয়েত বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করিয়ে নেবাব দরকার হয়না। যেখানে দরকার হয়, সেখানে তাই করি। আমাদের সংগঠন-প্রয়াসে তাঁদের অকুণ্ঠ দান আমাদেরকে তাঁদের কাছে চিরঋণী রাখবে।"

—"যদি অপরাধ না নেন, তাহলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

—"কুণ্ঠা কেন ?" ভাইস-ডিরেক্টব জানতে চাইলেন। তারপরই বল্লেন—"যা জানতে চান অসঙ্কোচে বলুন।"

—"আমরা শুনেছি এই সব কনষ্ট্রাকশনে আপনারা শ্রমিকদেরকে বিনা-পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেন।"

—"জানি আমাদের শত্রুরা তাই রটায়। কিন্তু কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। আমাদের কোন কোন কনষ্ট্রাকশন স্রেফ জন-সাহায্যে তৈরি হয়েছে; স্বেচ্ছা-সেবকরূপে কাজ করতে দলে দলে কর্মী এগিয়ে এসেছে। সেখানে পারিশ্রমিকের কোন কথাই ছিলনা। কিন্তু এখানে শ্রমিকদেরকে প্রতি সপ্তাহে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, এই যে হাজার হাজার শ্রমিক দেখছেন, এরা কিন্তু বছরের বারো মাসই এখানে কাজ করেনা। এক একদল কিছুদিন এখানে কাজ করে আবার চলে যায় ক্ষেত-কামারের কাজে, তখন আরো আরো দল আসে। ক্ষেত-খামারের কাজও বন্ধ থাকেনা, এখানকারও না। এখানকার শ্রমিকের সংখ্যা তাই বিশ থেকে ষাট হাজার পর্যন্ত ওঠা-নামা করে। এখানে কাজ করে কৃষকরা মাসে-মাসে কিছু বাড়তি আয় করে নিয়ে যায়। কাজেই এ কাজের জন্য তাদেরকে চাপ দিতে হয়না। কাজও হয় দ্রুততর। তারপর এখানে যে পরিবেশে তারা

থাকে, এখান থেকে গাঁয়ে গিয়ে সেই পরিবেশ নিজেরাই সৃষ্টি করে নিতে চায়। তাতেও পল্লীর নানা উন্নতি হয়।"

আসবার সময় ওখানকার ভিজিটিং বইয়ে লিখে রেখে এসেছিলাম— শুধু একটা রিজার্ভয়ার দেখে গেলাম না, একটা জীবন্ত কর্ম-ব্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও দেখে গেলাম—জন-বিশ্ববিদ্যালয়। জেল, কারখানা, স্যানাটোরিয়াম, নার্সারি, ওয়ার্কার্স প্যালেস, মিউজিয়াম যা দেখেছি প্রত্যেকটিকেই এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয় বলে মনে হয়েছে মডেল, চার্ট, কাজের গ্রাফ প্রভৃতি যত্রতত্র সংরক্ষিত দেখে। যাদের দেখবার চোখ আছে, দেখে বোঝবার মন আছে তারা এইসব প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখে অনেক কিছু যাতে শিখে যেতে পারে তার ব্যবস্থা সর্বত্রই রয়েছে। সবচেয়ে শিক্ষাপ্রদ আজ্ঞের ও অজ্ঞের বৈঠকী-আলোচনা।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়েও ভাইস-ডিরেক্টর নিজে প্রায় বিশজন অধ্যাপকদের নিয়ে আমাদের সব কিছু দেখিয়েছেন। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়টি যেন নন্দন-কানন। উঁচু-নীচু জমির ওপর দিয়ে পীচের রাস্তাগুলি চলে গেছে, রাস্তার দুইধারে উইলো গাছের সারি, দুটি রাস্তার মধ্যবর্তী জমি শ্যামতৃণে আবৃত, তাতে ফুলের ও ফলের গাছে নানা রংয়ের নানা ধরনের ফুল ও ফল হাওয়ায় দুলছে, মাঝে মাঝে সরোবর, সরোবর ছেয়ে রয়েছে অসংখ্য শ্বেতপদ্ম লালপদ্ম, দূরে দূরে এক একটি বিভাগের এক-একটি বাড়ী, ছাত্রছাত্রীদের ডরমিটারি, অধ্যাপকদের আবাসস্থল।

অভ্যর্থনা-বৈঠকে ভাইস-ডিরেক্টার পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শোনালেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি কি ছিল, লিবারেশনের পর কি পরিবর্তন আনা হয়েছে, সবই আমাদের শুনিয়ে দিলেন; জানিয়ে দিলেন চেয়ারম্যান মাও একসময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই লাইব্রেরিয়ান ছিলেন।

ভাইস ডিরেক্টর বল্লেন—"আমরা যে-সব ভুল শিক্ষা পেয়ে শিক্ষিত বলে পরিচিত হয়েছি, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে না সেই ভুল শিক্ষা পায় তার জন্য আমাদেরকে যেমন সতর্ক থাকতে হচ্ছে, তেমন শ্রমও করতে হচ্ছে। বিশেষ করে ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি আমাদেরও নতুন করে আয়ত্ত করতে হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা আর অধ্যাপক-শিক্ষকরা সবাই যেন আজ নব শিক্ষার্থী। ইতিহাস নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হচ্ছে, ক্যাপিটালিস্ট অর্থনীতির গলদ কোথায় তা ভালো করে বুঝতে হচ্ছে, প্রাচীন দর্শনকেও নতুন করে বিচার করতে হচ্ছে। অধ্যাপক-শিক্ষকদেরও নতুন করে পুরাতনকে জানতে হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও পুরাতনের সঙ্গে নতুনের পার্থক্য কি এবং কোথায় তা বিচার করে বুঝতে হচ্ছে। ফলে অধ্যাপক-শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী সবই যেন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী সতীর্থ হয়ে উঠেছে। তারপরেও রয়েছে গণ-সংযোগ। অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র, ছাত্রী সবাইকে গণ-সংযোগ রাখতেই হবে, ছুটিতে বেরিয়ে পড়তেই হবে।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলকাতায় একজন বৃটিশ সামরিক অফিসারের সঙ্গে আমার একদিন নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আমাকে আমাদের দেশের নানা অসুবিধার কথা নিয়ে দুঃখ করতে শুনে তিনি বল্লেন—"তবু এক বিষয়ে আমাদের চেয়ে তোমরা এগিয়ে আছ।"

আমি জানতে চাইলাম বিষয়টা কি।

তিনি বল্লেন—"তোমরা জান তোমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছ। কিন্তু আমরা ব্রিটেনের অধিবাসীরা তাও জানিনা। তোমরা মুক্তি পাবে আমাদের অনেক আগে।"

আমার চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখে তিনি বল্লেন—"তুমি তোমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে দুঃখ করছিলে। কিন্তু তুমি জাননা

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে এমনই ব্যয়বহুল করে রাখা হয়েছে যে ধনীক আর বণিক ছাড়া খুব অল্প লোকই ছেলে-মেয়েদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দিতে পারে। আমরা তিন ভাই চাকরি করে এক ভাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার ব্যয়ভার বহন করছি। এ যে কতবড় অনিয়ম তা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক একবারও ভেবে দেখেনা।"

কথাটা মনে পড়েছিল পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস ডিরেক্টর যখন শোনালেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারহাজার চার-শ ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে তিনহাজার আশি জন এসেছে কৃষক-শ্রমিকের পরিবার থেকে। আর একবারও কথাটা মনে পড়েছিল তিনজিনে যখন সেখানকার ন্যাশনাল মিউজিক কনজারভেটরির ডিরেক্টর জানালেন যে তিনশত সত্তরজন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই ফ্যাক্টরি ও ক্ষেতখামারের কর্মীদের ঘর থেকে এসেছে। সকল ছাত্র-ছাত্রীই বিনাব্যয়ে পাঁচবছর কাল দেশী ও বিদেশী গীত-বাদ্য সেখানে শিখতে পারে, খাবার ও থাকবার জন্যও অর্থব্যয় করতে হয়না।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন চারশত ষাটজন ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শিক্ষায় নিযুক্ত আছেন। চুয়ান্নজন অধ্যাপক নয়টি ভাষায় শিক্ষা দেন। হিন্দী শিক্ষার ক্লাশও রয়েছে। ভানু বর্মা ওই বিভাগের একজন অধ্যাপক, ভারতের উত্তর প্রদেশের অধিবাসী তিনি। ভাইস-ডিরেক্টরকে এবং আরো অনেককে অনুরোধ জানিয়ে এসেছি বাংলা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে। প্রাচ্যের সকল প্রধান-প্রধান ভাষা শিক্ষা দেবার ইচ্ছা নাকি তাঁদের আছে।

স্কুল-কলেজের শিক্ষার থেকেও বড় কথা এই যে কল কারখানা ক্ষেতে খামারে, নানা ধরনের কাল্চারাল প্যালেসে, ইউথস প্যালেসে সকল বয়সের লোকদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাই গত

বৎসরে উত্তর চীনের প্রায় পাঁচলক্ষ কৃষক কাজের ফাঁকে ফাঁকে লেখা-পড়া শিখে বয়স্কদের প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, অনেকে এরই মধ্যে সে শিক্ষা শেষ করেও ফেলেছে। এমন সব ফ্যাক্টরির ও খনির খবর পাওয়া গেছে, যেখানকার প্রতিটি শ্রমিক লিখতে পড়তে শিখেছে। চীন ভাষায় প্রায় দুহাজার শব্দ প্রকাশক অক্ষর শিখে হাজার হাজার শ্রমিক কৃষক এরই মাঝে সহজ সহজ বই পড়া অভ্যাস করে নিয়েছে, ছোট-খাট প্রবন্ধ লেখা শুরু করেছে, দৈনন্দিন ডায়েরী লিখছে। শিক্ষা আর সাহিত্য আমাদের দেশে এখনো সমাজের শ্রেণী-বিশেষের মাঝে সীমাবদ্ধ আছে, কিন্তু নয়াচীন যেমন যেমন শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তেমন শিক্ষাকেও নানা মাধ্যমের সাহায্যে প্রসারিত করছে। এ-কাজ শুধু সরকার করছেন না, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, বিভিন্ন লোকহিত প্রতিষ্ঠান, সমগ্র কমিউনিস্ট পার্টি সকল কাজের মাঝে এটিকে একটি বড় কাজ করে নিয়েছেন। কত সহজে কত বেশি শিক্ষা দেওয়া যায়, তাই হয়েছে শিক্ষাবিদদের প্রধান চিন্তার বিষয়। শিক্ষার জন্যই শিক্ষা নয়, শিক্ষার সাহায্যে মানুষকে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলে স্থির করা হয়েছে। নয়াচীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক বেকার থাকেনা।

আজকার তরুণ-তরুণী

চীনে গিয়ে সবার আগে যা চিত্তে ছাপ এঁকে দেয় তা যেমন চীনের স্বাভাবিক শিল্প-পরিচিতি, তেমনই নয়া চীনের নবীন-নবীনা তরুণ-তরুণী। অন্তত আমার চিত্তে সর্বপ্রথমেই এই দুটি ছাপ পড়ে একটি মনোরম অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছিল। ক্যান্‌টন থেকে পিকিং যেতে তিনদিন ট্রেনে থাকতে হয়। চীন পরিক্রমায় সর্বত্র আমাদের বহন করে নিয়ে যেত একখানি স্পেশাল ট্রেন। গাড়িগুলির সাজ-সজ্জা এবং এবং সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রাজকীয়। প্রতি চারজনের জন্য একটি কামরা, পুরু ভেলভেটে মোড়া স্প্রিং দেওয়া গদীর ওপর সাদা ধবধবে চাদর, বালিশ কম্বল সবই ধবধবে ওয়াড়ে আবৃত, মেজেয় পুরু কার্পেট, জানালায় সাদা পর্দা। দুটি আসনের মাঝখানে আবৃত ওয়াশস্ট্যাণ্ডের ওপর পানীয় জলপূর্ণ আবরণ দেওয়া পাত্র, প্লেটভর্তি টফি লজেন্স, সিগারেট, আসনের নীচে প্রত্যেকের জন্য একটি করে ড্রয়ার, প্রত্যেকের ব্যবহারের জন্য স্লিপার, তোয়ালে। কোরিডোরও কার্পেটে আবৃত। এক গাড়ি থেকে আরেক গাড়িতে যাবার জন্য প্লাটফর্মে নামবার প্রয়োজন হয়না। আমাদের জন্য দেওয়া এই ট্রেনে ডেলিগেটদের জন্য দুখানা বগি, আমাদের দোভাষীদের জন্য একখানা, একখানি ডাইনিং কার, আর একখানি মালপত্রের ভ্যান ছিল।

এত সব আরামের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমরা, অন্তত আমি, একটু

অসুবিধা বোধ করতাম দুটি কারণে। প্রথমত একখানি কোচের জন্য মাত্র একটি করে বাথ থাকায় আর দ্বিতীয়ত থাকবার কামরার দেয়ালে একটি করে অল্প হাওয়া-দেওয়া পাখা থাকায়। কামরাকে বড় চাপা-চাপা মনে হোতো। আমাদের দেশের ট্রেনগুলিতে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রতি চারজনের কি দুজনের জন্যও একটি করে বাথ থাকে, দুখানা করে সিলিংয়ে সংযুক্ত পাখা থাকে এবং কোরিডোর কোচ নয় বলে কামরাগুলির পরিসরও থাকে প্রশস্ততর—চাপা-চাপা মনে হয়না। সে যাই হোক, এই ট্রেনে আমরা চীন-প্রবাসের প্রথম তিনদিন অতিবাহিত করি। জানলা দিয়ে প্রকৃতির আর মানুষের শিল্প-সঙ্গতের নানা নিদর্শন দেখি আর ট্রেনের অভ্যন্তরে নয়া-চীনের কয়েকটি তরুণ-তরুণীর আপন-ভোলা সেবা-পরায়ণতা, অম্লান প্রফুল্লতা আর অসাধারণ নিয়মানুবর্তিতা দেখি। দেখি আর মনে মনে ভাবি শস্যক্ষেত্রে, বনানী-বিন্যাসে, পল্লী-সংস্থানে হয়ত নিজেদেরও অজানায় এই জাতি শিল্প-রচনা করে চলেছে আর জ্ঞাতসারে দেশের তরুণ-তরুণীদের ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলছে। এই দুই প্রয়াসের পিছনে যে মন কাজ করছে, সে তো মহাশিল্পীর মন। আমার এই প্রথম অনুভূতিই পিকিংয়ের এক বক্তৃতায় আমি ব্যক্ত করেছিলাম—চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙকে আমি প্রাচ্যের সর্বোত্তম, শ্রেষ্ঠতম, শিল্পী বলে মনে করি। তোষামোদ করবার জন্য অথবা অতিথির বিনয় প্রকাশ করবার জন্য ও-কথা আমি বলিনি, বলেছি আমার অন্তরের অনুভূতি অকপটে প্রকাশ করবার জন্যই। প্রকাশ্য সভায় যেমন ও-কথা বলেছি, তেমন চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ যেদিন আমাদেরকে দেখা দিয়ে ধন্য করেছেন, সেদিন তাঁকেও জানিয়েছি যে নয়া-চীনের তরুণ-তরুণী তার অনুপম সম্পদ।

সত্যই সেই যুবজন জাতির জীবন-প্রবাহে জোয়ার এনে দিয়েছে। তারা পাখীর মতো গান করে, কুরঙ্গের মতো নাচে, আবার সৈনিকের

মতো জাতির মানুষের সেবা করে। এতটুকু অতিরঞ্জন নয়। আমার মনে হয় ওরা অত যত্ন করে নাচ-গান শিখেছে বলেই সব কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে করতে পারে, নিয়মানুবর্তিতাকে একান্তই স্বাভাবিক করে নিতে পারে—বেতালা হয় না, ছন্দ ছেঁড়ে না, বে-সুরো কলরব করে না। সংস্কৃতিকে শিক্ষার সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, প্রাত্যহিক কাজের সঙ্গে, মিলিয়ে নিতে পারলে এই সুফলই পাওয়া যায়। চীনের ঐতিহ্যই এই। তাই দিকে দিকে তার শিল্প-সৃষ্টির নিদর্শন, তার সামাজিক-ব্যবহারে অনুপম সৌজন্য ও শালীনতা। এই ধারা অব্যাহত রাখবার জন্য মাও সে-তুঙের এবং চীন কমিউনিস্ট পার্টির বিরামবিহীন প্রয়াস সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তরুণ-তরুণীদের নব-রূপ অবলম্বন করে।

শুধু পিকিং থেকে ক্যানটন যাবার পথেই নয়, যে ছয় সপ্তাহ কাল আমরা চীনে ছিলাম, সেই ছয় সপ্তাহের প্রতিটি দিনের কেবলমাত্র বিশ্রামের সময়টুকু ছাড়া দিবা-রাত্রের অধিকাংশ সময় আমাদের সাথে-সাথে পাশে-পাশে থাকতেন আট-দশজন তরুণ-তরুণী দোভাষী আর সারা চীন পীস কমিটির কয়েকজন সদস্য। সকলেই নয়াচীনের নবসৃষ্টি। তাঁদের মাঝে দোভাষীরা আনকোরা গ্রাজুয়েট। ল্যাঙ্গোয়েজ গ্রাজুয়েট বলে তাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন। তিন বছর তাঁরা ইংরিজি ভাষা শিক্ষা করেছেন। চীন থেকে ইংরিজি এবং ইংরিজি থেকে চীনে তর্জমা করতে যাতে করে তাঁরা দক্ষ হয়ে ওঠেন, তাই তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়, ইংরিজি সাহিত্যের বোঝা এঁদের ঘাড়ে চাপানো হয় না। এঁদের পরিচালক পীস কমিটির লিয়াজঁ অফিসার উ চুয়ান-পুকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—"এঁদের ইংরিজি সাহিত্য পড়ানো হয় না কেন?"

—"এদের কাউকে সাহিত্যিক করে গড়া হবেনা বলে।" হেসে জবাব দিলেন। তারপর বল্লেন—"সাহিত্য যে আদৌ পড়ানো হয় না

তা নয়। ভাষা শিখতে, লিখতে এবং বলতে-কইতে, সাহিত্যের যতটুকু সন্ধান দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে হয়, তা দেওয়া হয় বৈকি। আসলে এরা সাহিত্যের ছাত্র নয়। তাদের পাঠ্য আলাদা। তাড়াতাড়ি এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রী যদি তৈরি করে নিতে না পারতাম, তাহলে আপনারা এসে কি বিপদেই না পড়তেন আর আমরাই কী বিব্রত হতাম, বলুন তো।"

সত্যিই তো, ইংরিজি সাহিত্যের বিচিত্র কাননে ঢুকলে তিন বছরে এঁরা বেরিয়ে আসতে পারতেন না। যতদিন এঁরা মধু সঞ্চয় করতে থাকতেন, ততদিন ইংরিজি ভাষা-ভাষী লোকেরা চীনে এসে বোবা আর কালা হয়ে থাকতে বাধ্য হোতেন। তাতে চীনের যতটা না ক্ষতি হোতো, পরিব্রাজকদের ক্ষতি হোতো অনেক বেশি। সন্ধান নিয়ে জানলাম, এইরকম ল্যাঙ্গোয়েজ গ্রাজুয়েট তৈরি করা হয় আরো নানা ভাষা শিক্ষা দিয়ে যথা—ফরাসী, রাশিয়ান, জার্মান, চেক, টিবেটান, মঙ্গোলিয়ান, উইগার এবং ইন্দোনেশিয়ান ভাষা-সমূহ। সম্প্রতি হিন্দুস্থানী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এশিয়ার প্রধান প্রধান ভাষাগুলি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও করা হবে। খুবই আগ্রহ নিয়ে তরুণ-তরুণীরা ভাষা শিক্ষা করেন, সুপণ্ডিত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, দেশ-সেবার আদর্শ নিয়ে।

কি মন নিয়ে এঁরা কাজ করেন, তার আভাস পাওয়া যাবে একটি দোভাষীর সঙ্গে, আমাদের ফেরবার পথে, একদিনের কথাবার্তা থেকে। বন্যায় রেল-লাইন ভেঙে যাবার জন্য আমাদেরকে একদিন হ্যাঙকোয় অপেক্ষা করতে হয়। ঠিক হয় হোটেলে চুপ করে বসে না থেকে আমরা সকাল বেলায় হ্যাঙকোর বিখ্যাত পাবলিক পার্কটা দেখে নোব। সবাই গেলাম পার্কে। বেশ বড় পার্ক। কিন্তু আরো বড় করা হচ্ছে। পার্কে জিমনাসিয়াম আছে, খেলার মাঠ আছে, ছোট-

খাট একটা স্টেডিয়ামও আছে, সুইমিংপুল আছে, ছোট্ট একটি চিড়িয়াখানাও আছে—দুটো রয়াল বেঙ্গল টাইগারও আছে সেখানে। হ্যাঙকো পীস কমিটির তরুণ সেক্রেটারি বল্লেন—"দেখবেন, বাংলার বাঘ দেখে বাঙালী আপনি ভাই বলে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে যাবেন না যেন। ওদের ভ্রাতৃপ্রেমের পরিচয় না আপনার পক্ষে, না আমাদের পক্ষে, প্রীতিপদ হবে।"

ভাই বলে আলিঙ্গন করতে অগ্রসর অবশ্য হলাম না আমি, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম ওই বাঘ দুটোকেও আপন বলে মনে হোলো বলে! অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম, ওদের দেখে এবং দেখিয়ে আমি গৌরব অনুভব করলাম কেন? অনেক চিন্তার আর বিচারের পর আবিষ্কার করলাম যে, ওদের পরিচয় রয়াল বেঙ্গল টাইগার বলে। যদি গোখ্রো সাপও দেখতাম তাহলেও হয়ত উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠতাম—"ওই আমার দেশের সবচেয়ে বিষধর সাপ, কী সুন্দর দেখুন।" ইরাকী বাঘ আর রুশের ভল্লুক কি আমেরিকার র‍্যাট্‌ল দেখলে কিন্তু আদৌ পুলকিত হতাম না।

পার্ক দেখতে দেখতে চলেছি। খানিকটা এগিয়ে দেখি ক্রিসেন-থিমামের চাষ হয়েছে বিঘেখানেক জমি নিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম—"মিউনিসিপালিটি কি ফুলের ব্যবসা করে?"

সেক্রেটারি জবাব দিলেন—"তা কেন। জীবনের মান যত উন্নত হচ্ছে, মানুষের ফুলের চাহিদা তত বেড়ে যাচ্ছে। আর আমরাও মানুষকে যত পারি ফোটা-ফুলের আবেষ্টনীর মাঝে রাখতে চাই—যাতে করে তারাও ফুলের মত ফুটে উঠতে পারে।"

—"উঠছেও তাই।" আমি বল্লাম।

—"লক্ষ্য করেছেন?"

—"না করে উপায় কি। পার্ক ভরতি যে-সব ছেলেমেয়েদের দেখছি, তারা তো ফুলের মতোই ফুটে উঠেছে।"

—"গ্রীষ্মের ছুটি কিনা, তাই দলে দলে দিকে দিকে ওরা পরিক্রমায় বেরিয়েছে। ওদের সঙ্গে মাষ্টার-মাষ্টারনী আছে, ডাক্তার-নার্স আছে, ওদের খাবারও ব্যবস্থা এইখানেই রয়েছে। দেখছেন ওরা ভলি-বল খেলছে, ওরা সাঁতার কাটছে, শুনছেন ওরা গান গাইছে, খানিকটা এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন কোন প্যাভিলিয়নে বসে একদল আলোচনা করছে, কেউ কেউ গাছের তলায় বা কুঞ্জে বসে পড়া-শুনো করছে।"

—"কতদিন এখানে থাকবে এরা ?"

—"একদল চলে যায়, আর একদল আসে। সারা-গরমের ছুটিটা এই করে ওরা কাটায়। কষ্টও করে, আনন্দও কুড়োয়। আমরা চাই আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে সকল দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত রাখতে।"

—"তাদের অভিভাবকদেরকেও।" মন্তব্য করলাম আমি।

—"হ্যাঁ, সন্তান-সন্ততি নিয়ে তাঁরা যাতে না বিব্রত থাকেন, সে চেষ্টাও করি আমরা।"

এই সেক্রেটারির সঙ্গে দুটি তরুণী ছিলেন। আমি অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম যে আমার কথাগুলো তর্জমা হবার আগেই তাঁরা বুঝতে পারছেন। আমি জানতে চাইলাম—"তোমরা কি ইংরিজি জান ?"

একজনা ইংরিজিতেই জবাব দিলেন—"আমরা দুইজনাই এইবার ইংরিজিতে গ্রাজুয়েশন পেয়েছি।"

—"এতক্ষণ কোন কথা বলনি কেন ?"

—"আপনি তো আমাদের কাছে কিছু জানতে চাননি।"

চীনে থাকতে এটি খুব লক্ষ্য করেছি। ছেলে-মেয়েরা গলা বাড়িয়ে কিছু বলবার জন্য কখনো ব্যস্ততা প্রকাশ করেনা। হয়ত আমার দোভাষীর পাশেই আর একজন দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কখনো

দেখিনি সে তার সঙ্গীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কিছু বলেছে। আবার এও লক্ষ্য করেছি যাকে যাঁর কথা ভাষান্তরিত করা হচ্ছে, তাঁর বক্তব্য ভালো করে বুঝতে না পেরে যদি-বা দোভাষীকেই তা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে বল্লাম, দোভাষী কিন্তু কিছুতেই নিজের মতো করে তা বুঝিয়ে দেবেনা। আমি যে বুঝিতে পারিনি বক্তাকে তা জানাবে এবং তখন তিনি যা বলবেন তাই আমাকে বুঝিয়ে দেবে। লিয়াজঁ অফিসার, আমাদের এবং দোভাষীদেরও অভিভাবক। মিঃ উ ইংরিজি জানেন না, কিন্তু মিঃ ট্যাঙ ইউরোপে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। মিঃ উ'র কোন বক্তব্য কখনো যদি ভালো বুঝতে না পারতাম মিঃ ট্যাঙ কিন্তু তা বোঝাবার দায়িত্ব নিজে নিতেন না, আমার সংশয় মিঃ উ'কে জানাতেন এবং তিনি ফিরে যা বলতেন তাই আমাকে শোনাতেন। আবার ভাষান্তরিত করবার দায়িত্ব যখন তাঁর থাকত না, তখন নানা বিষয়ে তাঁর নিজের মত আমাকে জানাতেন। এই নিয়মানুবর্তিতা তরুণ-তরুণীরা এমন স্বাভাবিক করে নিয়েছে যে ছয় সপ্তাহের মাঝে কখনো কাউকে তিরস্কৃত হতে দেখিনি। অথচ শুনতাম প্রতিদিনই তাদের বৈঠক বসে এবং সেখানে সকলের কাজের সমালোচনা হয়। কাজের সময় মত-বিরোধ তারা প্রকাশ করেনা—মত-বিরোধ যদি উপস্থিত হয়, তা-হলে বৈঠকে বসে তার ফয়সালা করে নেয়। তারপর চলে সৈনিকের মতো কাজ। কাজের সময় কচায়ন হয় না বলেই কাজ অকাজে পরিণত হয় না।

কি মন নিয়ে তরুণ-তরুণীরা কাজ করেন তারই আভাস দিতে গিয়ে হ্যাঙকো-পার্কের কথা তুলেছিলাম। এবার তাই বলি। পার্কে ঘুরে-ঘুরে আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন আমাদের একটা মণ্ডপে নিয়ে বসানো হোলো। সেখানে চা, অরেঞ্জ-স্কোয়াশ, ফল, সিগারেট সবই ছিল, যেমন সর্বত্র থাকে। চা খেতে খেতে

আমার মগজে একটা দুষ্টু-বুদ্ধি গজালো। চ্যাঙ স্থ-লিন নামীয়া একটি তরুণী দোভাষী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি বল্লাম—"শোন, চ্যাঙ স্থ-লিন।"

সে আরো কাছে এসে দাঁড়াল। পার্কে হ্যাঙকোর যে মেয়ে দুটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাদেরকে দেখিয়ে আমি বল্লাম—"ওই যে মেয়ে দুটি দেখছ, ওদের সঙ্গে আলাপ হোলো। টাটকা গ্রাজুয়েট ওরা। কিন্তু দেখলাম তোমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে আর ইংরিজিও তোমার চেয়ে ভালো শিখেছে।"

একগাল হেসে চ্যাঙ স্থ-লিন বল্লে—"তাই তো হওয়া উচিত।" আমি তো অবাক। বলে কি এই ক্ষুদে মেয়েটা। আমি ভেবেছিলাম তার ঠোঁট ফুলে উঠবে, চোখ জলে ভরে যাবে, তারপর নাতনীর মতো ওই মেয়েটিকে আদর করে বলব—"না গো, না। তোমার চেয়ে সত্যিই ওরা কিছু বুদ্ধিমতী নয়।" কিন্তু ওর জবাব শুনে আমি জব্দ।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন চ্যাঙ স্থ-লিন, ওদের বেশি বুদ্ধিমতী জ্ঞানবতী হওয়া উচিত কেন?"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে বসে পড়ে সে বল্লে—"দেখুন, আমরা লিবারেশনের তিন-বছরে গ্রাজুয়েট হয়েছি। আর ওরা গ্রাজুয়েট হোলো চতুর্থ বছরে। লিবারেশনের পরের একটা অতিরিক্ত বছরের দান তুচ্ছ হতে পারেনা। ওরা তো বেশি শিখবেই।"

এ তো শেখা-বুলি নয়। এই তার প্রত্যয়। তাদের সকলেরই তাই। লিবারেশনের পর এক একটি দিন যাচ্ছে আর জাতিও এগিয়ে যাচ্ছে এবং জাতির প্রতি-লোকেরই কর্তব্য হচ্ছে সমগ্রভাবে জাতিকে এগিয়ে দেওয়া। এই হচ্ছে নয়া-চীনের তরুণ-তরুণীর বিশ্বাস ও সঙ্কল্প। তাই কূট-তর্কে কালহরণ না করে ন্যস্ত কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে

সম্পন্ন করে পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত থাকাই হচ্ছে নয়া-চীনের তরুণ-তরুণীর জীবন-সাধনা।

আমাদের প্রতিনিধিদের সদস্যরা শিল্পী বলেই কিছু আয়েসী; সময় সম্বন্ধে সকলেই তেমন সচেতন নন। তাই কোথাও কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট কাজ থাকলে এক-ঘণ্টা আগে থেকে ঘরে-ঘরে দোভাষীরা টহল দিতেন। একই লোকের ঘরে পাঁচ-বার সাতবার করেও যেতে হোতো। কখনো তার জন্য কাউকে বিরক্তি প্রকাশ করতে শুনিনি। এই ছেলে-মেয়েদের নেত্রী ছিলেন মাদাম কু চা-ই। পিকিং পীস-কমিটির সেক্রেটারি-জেনারেলের সহধর্মিণী এবং সহকর্মিণী। ঘর-সংসার ফেলে রেখে ছয় সপ্তাহকাল আমাদের সুখ-সুবিধার সব ব্যবস্থা তিনিই করতেন। প্রতিনিধিদের কে কি খেতে পারছে বা পারছে না তার খবর তিনি রাখতেন এবং প্রতিলোকের রুচি অনুযায়ী খাবার কি করে তৈরি যায়, তাই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। কোথাও যেতে হলে কে কোন্ গাড়ীতে উঠবেন, কেউ পড়ে রইলেন কিনা এসবেরও তদারক তিনিই করতেন। যেদিন আমাদের অভিনয় থাকবে, সেদিন সময় মতো প্রতিনিধিকে হলে পাঠাবার দায়িত্ব তাঁর, অভিনয় ভেঙে গেলে প্রতিনিধিকে হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ হবেনা—যন্ত্র-পাতি পাঠাবার ব্যবস্থা তিনিই করবেন। সকাল সাতটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত তাঁকে কর্মব্যস্ত দেখতাম। এর মাঝে কখন যে তিনি বিশ্রাম করতেন, তা তিনিই জানেন! ছয় সপ্তাহের প্রতিটি দিন তিনি এইভাবে শ্রম করেছেন। আমি তাঁকে বলতাম মাদার-এঞ্জেল।

ছেলেরা যেমন দোভাষীর কাজ করতেন, তেমন ডেলিগেটদের লাগেজ নিয়েও সর্বদাই তাঁদেরকে বিব্রত থাকতে হোতো। হোটেল থেকে স্টেশনে, স্টেশন থেকে ট্রেনে, আবার ট্রেন থেকে নতুন যায়গার নতুন হোটেলে প্রত্যেক প্রতিনিধির ঘরে-ঘরে কি করে যে ওই

ভারি-ভারি মাল স্থানান্তরিত হোতো, তা ওই ছেলেরাই কেবল জানতেন। তাঁরা স্মরণ করলেই আলাদীনের দৈত্য তাঁদের সাহায্যে ছুটে আসত কিনা তা বলতে পারিনা—তবে এত ওঠা-নামা, স্থান পরিবর্তনেও কখনো কারু মাল আর কারু ঘরে যায়নি, হারায়নি, ভাঙেনি একটাও। এঁরাও নতুন গ্রাজুয়েট—মাল বওয়ায়, মালের হিসেব রাখায় এঁদের অভ্যস্ত থাকবার কথা নয়। কিন্তু যে-হেতু ওটা তাঁদের কর্তব্য নিরূপিত হয়েছে, সেই হেতু শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজকে ত্রুটিহীন করতে হবে যে, সে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় বলে মেনে নিয়েছেন। প্যান চিন-ই আর কাও সি-নান তরুণদ্বয় ছিলেন সব চেয়ে পরিশ্রমী কর্মী।

পিকিংয়ে পৌঁছে আমরা মঞ্চে ভারতীয় আবহ সৃষ্টি করবার জন্য একটি দৃশ্যপটের পরিকল্পনা করেছি। পেন্সিল দিয়ে যে স্কেচ এঁকে দিয়েছিলাম, তা আমাদের কোন চিত্র-শিল্পীর হাতে পড়লে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। কিন্তু ও-কাজের ভার যাঁর ওপর দেওয়া হয়েছিল, তিনি পরমানন্দে সেইটিই নিয়ে গেলেন। অভিনয়ের দিন মঞ্চ দেখতে গিয়ে দেখি দৃশ্যপটটি তখনো আসেনি। পিকিংয়ে ইউথ্‌স্‌ প্যালেসে আমাদের অভিনয় হোতো। সেখানকার কর্মীরা বল্লেন দৃশ্যপটটির জন্য আমাদের ভাবতে হবেনা, ঠিক সময়ে তা এসে যাবে, আর যে-জিনিসটি যেমন চাই, বুঝিয়ে দিলে তাঁরা ঠিক করে রাখবেন। তাঁরা বুঝে নিলেন, কিন্তু গলা বাড়িয়ে বল্লেন না, ওরকম না করে এই রকম করলে ভালো হয় মশাই। যখন তাঁদের বক্তব্য শুনতে চাইলাম, তাঁরা যা ভালো মনে করেন তাই জানালেন। একবার যা ঠিক হয়ে ঘটবে, তার আর ব্যতিক্রম ঘটবেনা, আর লীডার যে নির্দেশ দেবেন, তার ব্যতিক্রম তো ঘটবেই না। চীনের সমগ্র সফরে আমাদের একই রকম ব্যবস্থা হোতো। ওই ছেলে-মেয়েরাই

কাজ করতেন। অবশ্য দেবব্রত বিশ্বাস সর্বদাই সাহায্য করতেন। মঞ্চ-ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁর ওপরই দেওয়া হয়েছিল। তিনিও ওই ছেলে-মেয়েদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আমাদের প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু চীন-ভাষায় তর্জমা করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি বিষয় উপস্থিত হবার আগে তা দর্শক-শ্রোতৃদেরকে শুনিয়ে বুঝিয়ে দেবার ভার পড়েছিল ল্যু ওয়ান-কু'র ওপর। সুন্দরী ওই সপ্তদশীর একটি অপূর্ব ব্যক্তিত্ব আছে। মাত্র একদিন সমগ্র প্রোগ্রাম বুঝে নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে তিনি কাজ করে যেতেন। শুধু যে প্রোগ্রাম বুঝিয়ে দেওয়াই তাঁর কাজ ছিল, তা নয়—আমাদের শিল্পীদেরকেও নির্দেশ দিতে হোতো কখন কাকে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে হবে, কত আগে যন্ত্র বেঁধে নিতে হবে। কাজটি শুনতে যত সহজ মনে হয়, আসলে কিন্তু তা নয়। মাঝে মাঝে ল্যু বিব্রত হয়ে পড়তেন। কিন্তু একদিনও কোন অভিযোগ তিনি করেননি। আমাদেরই কারু কাছ থেকে শুনে আমি একদিন ডেলিগেটদেরকে অনুরোধ করলাম যে, মেয়েটির কর্তব্য-নিষ্ঠার ওপর অত জুলুম যেন না করা হয়; নিজেরাও যেন একটু সজাগ থাকেন। ল্যু কিন্তু অত্যন্ত কুণ্ঠিতা হলেন। তিনি বল্লেন—"না, না, ওঁরা আমাকে বেশি খাটিয়ে নেন না।" মেয়েটির গলা মিষ্টি, ভালো গান গাইতে পারে। আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে যে ছেলে-মেয়েরা থাকতেন তাঁদের প্রায় সকলেই গান গাইতে পারতেন। প্রায় সকলেই স্বর-লিপি তৈরি করতে জানতেন, সহজেই আমাদের গান তুলে নিতে পারতেন। আমাদের শিল্পীরাও অবশ্য দু'একটি চীনা গান তুলে নিয়েছেন। কিন্তু সে নিতে পেরেছেন কারা? হীরাবাঈ, দেবব্রতের মতো শিল্পীরা। ওই ছেলেমেয়েদের বয়েস আর অভিজ্ঞতা এবং সাধনার সে সুদীর্ঘ অবসর না হওয়া সত্ত্বেও যে দক্ষতা তাঁরা অর্জন করেছেন, তাই তো বিস্ময়ের বিষয়।

লিয়াজঁ অফিসার উ চুয়ান-পু'র সেক্রেটারি চ্যাঙ স্যান-তাও আর একটি তরুণী যাঁর কাজ দেখে বিস্মিত হতে হয়। আগেই বলেছি মিঃ উ ছিলেন আমাদের প্রবাস-কালের অভিভাবক, পরিচালক এবং বন্ধু। উনত্রিশটি লোকের হিতাহিতের সুখ-স্বস্তির সকল দায়িত্বই যে কেবল তার ওপর ন্যস্ত ছিল তা নয়—বিভিন্ন শহরে অভিনয়ের ব্যবস্থা, প্রত্যেক শহরের সাহিত্যিক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, গাইয়ে-নাচিয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যবস্থা, প্রত্যেক জায়গার দর্শনীয় স্থান দেখাবার সুযোগ করে দেওয়া সম্বন্ধে তিনিই ছিলেন মুরুব্বি। অবশ্য সর্বত্রই স্থানীয় পীস-কমিটিই দায়িত্ব নিতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন সেইসব কমিটির সঙ্গে আমাদের যোগরক্ষার মাধ্যম। কাজের তাঁর অন্ত ছিল না। আর তাঁর কাজের প্রায় সকল ভার বইতে হোতো তাঁর ক্ষীণকায়া সেক্রেটারি কুমারী চ্যাঙ স্যান-তাওকে। অবিরাম চিঠি-পত্র লেখা, তার করা, প্রত্যেক শহরের সঙ্গে আমাদের গতির সংযোগ রাখা, পিকিং দিল্লী আর আমাদের অবস্থিতি এক সূত্রে গেঁথে রাখা, সংবাদপত্রের আর রেডিওর মাধ্যমে ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিচিতির সঙ্গে চীনের জনগণের পরিচয় করিয়ে দেবার সর্ববিধ আয়োজন মিঃ উ এই মেয়েটির সাহায্যেই করতেন। ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর হোতো এবং কাজ এত শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে চলত যে মনে হোতো কতদিন ধরেই না আয়োজন হয়েছে।

পিকিং ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছুলাম রাত বারোটারও পর। আমাদেরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উপস্থিত ছিলেন পীস-কমিটির অফিসাররা, সাহিত্যিক শিল্পীরা, বিভিন্ন দেশের শান্তি কর্মীরা। তাঁদের মাঝে একজন আফ্রিকান ছিলেন, একজন জাপানী ছিলেন, একজন অষ্ট্রেলিয়ান ছিলেন, ইউরোপীয় পুরুষ ও মহিলাও দু'চার জন ছিলেন। আর ছিলেন উনত্রিশটি তরুণী উনত্রিশটি ফুলের তোড়া নিয়ে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে

আমাদের প্রত্যেককে উপহার দেবার জন্য। ষ্টেশনে নামবার আধ ঘণ্টার মাঝেই আমরা উনত্রিশটি নর-নারী হোটেলের নির্দিষ্ট ঘরে-ঘরে সুখ-শয্যায় শয়ন করবার সুযোগ পেলাম।

রাত দেড়টায় হ্যাংচো পৌছেচি। সেখানেও প্লাটফর্মে পীস-কমিটির অফিসাররা, সাহিত্যিকর শিল্পীরা, আর ওই উনত্রিশটি ফুলের তোড়া নিয়ে উনত্রিশটি তরুণী। ফেরবার পথে প্রায় রাত দুটোয় হ্যাংকো ষ্টেশনে পৌছেও দেখি ওই একই ব্যবস্থা। সকালে, দুপুরে, অপরাহ্নে, নিশীথে যখনই যেখানে গেছি ওই একই ব্যবস্থা। আবার প্রত্যাবর্তনকালেও ওই একই ব্যবস্থা—অতিরিক্ত থাকত প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সমবেত গান। স্থানীয় সাহিত্যিক-শিল্পীরা আর ওই উন-ত্রিশটি মেয়ে আর আমাদের শিল্পীরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' গান গাইবে। চীনা গানও গাওয়া হবে যাতে সুর মেলাবেন আমাদের গায়ক-গায়িকারা। এরও ব্যতিক্রম নেই।

সাংহাই আর্ট য়্যাণ্ড কালচার এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তরুণ-তরুণীরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা করলেন। আমরা কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই লম্বা-লম্বা বাঁশি আর বড়-বড় ঢাক বেজে উঠল। উপজাতীয় পোশাক পরা ছেলেমেয়েরা আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা হল-ঘরে বসালেন। যথারীতি পানাহার ও বক্তৃতার পর শুরু হোলো গান এবং গান থেকে নাচ ; উদ্দাম নৃত্য। সমস্ত উপজাতীয় তরুণ-তরুণী, আমাদের সকল ডেলিগেট, আমন্ত্রিত অতিথিগণ সকলে হাত ধরা-ধরি করে নাচতে শুরু করলেন। আমিও রেহাই পেলামনা। কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে আমাকেও ওঁরা নৃত্যের আবর্তে টেনে নিয়েছেন। চেয়ে দেখলাম দেবব্রত বিশ্বাসও তাঁর প্রকাণ্ড দেহটি নিয়ে নৃত্য করছেন আর দেখলাম পরমানন্দে নৃত্য করছেন খর্বকায় মাস্টার কৃষ্ণরাও পুল্লামবকর। মহাকবি ভাল্লাথল

উপস্থিত থাকলে তাঁকেও হয়ত রেহাই দেওয়া হোত না। নাচের ক্রেসেণ্ডোতে আমাকে ওঁরা চেয়ার করলেন এবং কাঁধে রেখেই নাচতে লাগলেন। আমি সেদিন ধুতি-চাদর পরে গিয়েছিলাম। ধুতি ফেঁসে গেল। আমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে দর্শকরা ভাবলেন বুড়ো ভয় পেয়েছে। তাঁরা আমাকে আরো ভীত করবার জন্য নাচিয়েদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। আমি বুঝিয়ে বলতে পারিনা কী বিপদেই আমি পড়েছি। ওই অবস্থাতে থেকেই চাদরে-পাঞ্জাবীতে জড়িয়ে দেহটাকে পুঁটুলি করে ফেল্লাম। সর্বরক্ষা হোলো এই কারণে যে, নাচিয়েরা আমাকে হল-ঘরে বা তার সামনেকার বাগানে নামিয়ে দিলেন না, বস্তার মতো বয়ে নিয়ে একেবারে ফেল্লেন আমার জন্য নির্দিষ্ট গাড়িতে। হাঁফ ছেড়ে এতক্ষণে আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম। ওরা বুঝলে লীডার এদের দেওয়া সম্মানে উল্লসিত হয়েই হাসছে, তাই উচ্চতর কণ্ঠের হাসি দিয়ে আমার হাসি ওরা তলিয়ে দিল।

ওইদিন রাতেই আমরা সাংহাই ছেড়ে চলে এলাম। বিকেলের নৃত্যোৎসব হয়ত অনেকের চিত্তকে তখনো নৃত্যশীল রেখেছিল। তাই প্লাটফর্মে অপরাহ্ন কালের উৎসবের পুনরভিনয় শুরু হোলো। তখন আমি আর ধুতি-চাদর পরে নেই। তবু কৌশলে নিজেকে নৃত্য-ব্যূহের বাইরে রেখেছিলাম। মাস্টার কৃষ্ণরাও তখনো খুব নেচেছিলেন।

সাংহাইয়ের একটি নার্সারির শিশুরাও একদিন সকালে আমাদেরকে তাদের নাচ দেখালো। দেড় থেকে সাত বছর বয়েস এই শিশুদের। ১৭৬টি শিশু এই নার্সারিতে থাকে। শনিবারে তাদের অভিভাবকরা তাদেরকে বাড়ি নিয়ে যায় এবং ফিরিয়ে দিয়ে যায় সোমবারে। শুনলাম এখানে শিশুদেরকে সোবিয়েত পরিকল্পিত

আধুনিকতম প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়। কী সে প্রণ তার বিশেষত্ব কি, তা জানবার সুযোগ অবশ্য পেলামনা। সময়াভাব। শুধু জানলাম শিক্ষাকে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রম-বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, নিরর্থক একটা বোঝা করে তোলা হয় না। উদ্দেশ্যবিহীন, পরিণতিতে পৌঁছে দেবার দায়িত্ববিহীন শিক্ষা অন্তঃসারশূন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এ-কথা আমি জানি এবং মানি। এই নার্সারীর শিক্ষয়িত্রীরা, নার্সরা অধিকাংশই তরুণী। ভবিষ্যতের জাতি গড়বার দায়িত্ব যে এঁদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে, এ-সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন। মুখ অপ্রসন্ন নয়, ভ্রূতে কুটিলতা নেই, দৃষ্টিতে নেই কঠোরতা। প্রফুল্ল মুখ, প্রসন্ন হাসি, ব্যবহারে প্রীতির পরিচয়, শিশুদের কাছে তাঁরা অভিভাবকদের চেয়েও প্রিয়জন। নিশ্চিতই নয়া চীনের নতুন সৃষ্টি।

সাংহাই স্যানাটোরিয়ামের তরুণ ডিরেক্টর তারুণ্যের আর একটি রূপ প্রকাশ করলেন। তিনি ডাক্তার না হয়েও স্যানাটোরিয়ামের ডিরেক্টর—রুগ্ন শ্রমিকদের দুর্গতি ও দুশ্চিন্তা তিনি দরদী মন দিয়ে বিচার করতে পারেন বলে। যেমন স্থির প্রকৃতির লোক, তেমন শিল্পানুরাগী এবং সেই কারণেই জাতীয় প্রগতিকে মানুষের মানুষত্ব প্রতিষ্ঠা বলেই বুঝেছেন। মানুষকে ইনি নারায়ণ বলেন না সত্য, কিন্তু মানুষত্বের প্রতি যে অচলা ভক্তি নিয়ে, যে নিষ্ঠা নিয়ে, ইনি মানুষের সেবা করেন, তাকে নারায়ণ পুজার সঙ্গে তুলনা করলে অন্যায় হয় না, অতিরিক্ত বলা হয় না,—পুজার উপকরণে যদিও পার্থক্য দেখা যায়। চীনের যে প্রতিষ্ঠানগুলিই আমরা দেখেছি, তার কোনটিরই কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে এতটুকু দাম্ভিকতার, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের, অহমিকার বা অসহিষ্ণুতার পরিচয় পাইনি। সকলেই আমাদের সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করেছেন, আগ্রহভরে সব কিছু দেখিয়েছেন, বুঝিয়েছেন, আমাদের

সমালোচনা শুনতে চেয়েছেন। আমলাতান্ত্রিক এবং আমলাতান্ত্রিকতা চীনে আমি অন্তত দেখতে পাইনি।

পিকিং জেলের ডিরেক্টরের সঙ্গে পিকিং পীস-কমিটির ডিরেক্টর যখন আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমি তো হেসেই ফেল্লাম।

জেল-ডিরেক্টর জানতে চাইলেন আমি হাসছি কেন।

—"তোমাকে দেখে।" হাসতে হাসতেই বল্লাম।

কিসে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদের হাসির পাত্র হলেন, তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

আমি বল্লাম—"এত অল্প বয়েস তোমার, আর এত বড় একটা জেলের উনিশ-শো কয়েদীর দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা তুমি। আসবার সময় জেল-ডিরেক্টরের যে রূপ আমি কল্পনা করে এসেছিলাম, তার সঙ্গে কিছুই যে মেলেনা। তোমাকে তো অনায়াসে আমাদের নাচিয়েদের গাইয়েদের সঙ্গে বেমালুম মিলিয়ে দেওয়া যায়—পিকিং জেলের ডিরেক্টরের পৃথক অস্তিত্ব বোঝাই যাবেনা।"

এবার তিনিও হাসলেন এবং হেসে-হেসেই বলতে লাগলেন—"তাহলে এবার আমাকে বলবার অনুমতি দাও, লীডার। প্রথমত, আমি কয়েদীদের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা নই, আমি তাদের সহচর, সহায়ক, বন্ধু। দ্বিতীয়ত, আমি বয়েসে নবীন বলেই তো নব-জীবনের প্রতি ভরসা রাখি। যাদের আমরা জেলে রেখেছি তারা যে জন্মগত অপরাধী নয়, এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি। সমাজ-ব্যবস্থার দোষে অথবা জীবনা-দর্শকে ভুল করে বোঝবার ফলে এরা অপরাধী হয়েছে—এ-কথা আজকার নবীন আমরাই বুঝেছি। তাই আমরাই এই সব কাজ করবার উপযুক্ত বিবেচিত হই।"

জেল দেখতে গিয়ে দেখলাম বয়েসে নবীন হলেও বিজ্ঞতায় তিনি প্রবীণ। ব্যবস্থায় অনভিজ্ঞতার পরিচয় নেই। কয়েদীদের মানসিক

পরিবর্তনের নানা ব্যবস্থাই রয়েছে। মানুষকে ভালো না বাসলে শুধু সেই সব ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। জেলের ভিতরেই অভিনয়ের ও নৃত্যের মঞ্চ আছে, নানা রকম বাদ্যযন্ত্রও আছে, আলোচনা বৈঠকের স্থানও আছে। জেলের ভিতরে কোথাও সিপাহী সান্ত্রী না দেখতে পেয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। জবাব পেলাম —"ওদের আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই না যে ওরা অপরাধী।"

তারপর একটা টাওয়ার দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন—"আগেকার দিনে ওইখানে বন্দুক কাঁধে নিয়ে প্রহরীরা দিবারাত্র পাহারা দিত, প্রচুর হল্লাও করত। জায়গাটা এখন খালি পড়ে রয়েছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"সব কয়েদীই কি কারাজীবন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে?"

—"তা কি কেউ নেয়!" জবাব দিলেন তিনি।

—"পালাবার চেষ্টা করেনা? বিদ্রোহ হয়না?"

—"উল্লেখযোগ্য কিছু হলে তো বন্দুকধারী প্রহরী রাখতে বাধ্য হতাম। বলছি না যে অসন্তুষ্ট কয়েদী নেই। কিন্তু বেশি কয়েদীকেই আমরা বোঝাতে পেরেছি যে আমরা তাদেরকে কলঙ্কমুক্ত করে সামাজিক মানুষ করে গড়তে চাই। আমাদের বিশ্বাস, ধৈর্য ধরে সহিষ্ণুতার সঙ্গে কাজ করতে পারলে আমরা সবারই মনের রূপান্তর ঘটাতে পারব। শাস্তি দেবার জন্যই জেলকে আমরা জিইয়ে রাখিনি, অপরাধীদের মনের রূপান্তর ঘটানোই আমাদের কাজ। আজই সবাইকে এ-কথা বোঝাতে না পারলেও একদিন পারবই।"

তরুণ ডিরেক্টরের এই বিশ্বাস জাগ্রত যৌবনের বিশ্বাস। প্রবীণরা নতুন নিয়মের বশবর্তী হয়ে এ-কথা মুখে বলতে পারেন, কিন্তু সকলেই এমন দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করতে পারেন না। যাঁরা পারেন তারা ব্যতিক্রম। তরুণরা যা বিশ্বাস করেন, সারা মন দিয়েই তা কাজে রূপায়িত করতে

চান, সংশয় তরুণ-মনে স্থান পায় না। অবশ্য আমি জাগ্রত তরুণের কথাই বলছি, মোহাচ্ছন্ন তরুণের কথা নয়।

কোয়ানতিং রিজার্ভয়ার দেখতে যাই। ওটি তৈরি হচ্ছে বন্যা নিবারণ করবার জন্য। চল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে কাজ হচ্ছে। চল্লিশ থেকে ষাট হাজার শ্রমিক তিন শিফ্‌টে দিবারাত্র কাজ করছে। দেখলাম তরুণ এঞ্জিনিয়াররা কাজ করছেন। একজন তরুণ মডেল দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কি কাজ তখন তিনি করছেন। কোন কিছু তাঁর কাছে অস্পষ্ট নেই।

প্রবীণ ডিরেক্টর আর তাঁর সহকারী আমাদেরকে সমগ্র কর্মক্ষেত্রটি দেখাচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—"এ-সব কাজে চীনের অভিজ্ঞতা বেশি থাকবার কথা নয়। অথচ বিদেশী এঞ্জিনিয়ারও দেখছি না। কখনো কি মুশকিলে পড়তে হয় না?"

—"মুশকিলে পড়লেই সোবিয়েতের বিশেষজ্ঞদের ডেকে পাঠাই। এর প্ল্যানটা তাঁদের দিয়েই তৈরি করা হয়েছিল। আমরা আমন্ত্রণ করলেই তাঁরা চলে আসেন। কিছুদিন এখানে থেকে আমাদের কাজের ত্রুটি দেখিয়ে দেন এবং ভবিষ্যতে কি কারণে কোন্ বিপদের মুখোমুখি হতে পারে তারও নির্দেশ দেন আর প্রতিকারের পন্থা বুঝিয়ে দেন। আমাদের তরুণ এঞ্জিনিয়াররা তাঁদের উপদেশ অনুসারে কাজ করেন।"

১৯৫১ সালের অক্টোবরে রিজার্ভয়ারের কাজ পত্তনি হয়, শেষ হবার সময় ছিল ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে। আমরা তার প্রায় দু'মাস আগে চলে এসেছি। জানিনা কাজ শেষ হয়েছে কিনা। সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়। আমার কাছে বড় কথা হচ্ছে তরুণ এঞ্জিনিয়ারদের আত্মপ্রত্যয় ও জাতির প্রয়োজন উপলব্ধি।

তিনজিন পীস কমিটির সেক্রেটারির সেক্রেটারি নিযুক্তা হলেন

আমার তিনজিনের অভিভাবিকা। তিনি বিবাহিতা, দুটি সন্তানের জননী। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পীস-কমিটিতে কাজ করেন। শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"ঝগড়া-ঝাঁটি কখনো হয় স্বামীর সঙ্গে?"

হেসে তিনি জবাব দিলেন—"কখনো কখনো হয়। কিন্তু সে আমার দোষে।"

—"যথা?" আমি জানতে চাইলাম।

—"আমি বড় বেশি সমালোচনা করি। তাঁর কাজের এবং আমারও। অতটা তাঁর ভালো লাগেনা।"

—"পরিচয় করিয়ে দিলে না তো।"

—"এখানে নেই যে। ছেলে-মেয়েকে আর আমার শাশুড়িকে নিয়ে বাইরে চলে গেছেন। এখন তো ছুটি। আমি যেতে পারিনি তোমরা আসবে বলে। তোমরা চলে গেলেই আমিও যাব।"

—"আমরা এসেই তোমার আনন্দে ব্যাঘাত ঘটালাম, বল।"

—"তা কেন। ডবল আনন্দ আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। আপনাদের সঙ্গে আলাপের আনন্দও পেলাম আবার ছুটির আনন্দও দু'দিন বাদেই পাবো।"

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারিণী এই তরুণী। সহজভাবে অনেক গভীর কথা বলতে পারেন। সামনে ঝুঁকে পড়ে বল্লেন—"দেখুন, আগেকার আমলে কর্মীরা জানত না ছুটি কি বস্তু। মানেন?"

—"মানি।" আমি বল্লাম।

—"আজ আমরা ছুটি পাচ্ছি।"

—"তা তো দেখছি।"

—"তার মানে যদি এই বলি যে, জাতি এতটা সচ্ছল হয়েছে যে কর্মীদেরকে ছুটি দিতে পারে মাইনে না কেটে, তাহলে কি আপনি প্রতিবাদ করবেন?"

—"না। পুরো মাইনেয় ছুটি দেবার সক্ষমতা জাতির সম্পদ বৃদ্ধির পরিচয় দেয় বলেই তো মনে হয়।"

—"আমরা কাজ করে যদি জাতির সম্পদ বাড়াতে পারি, তাহলে এই ছুটির মেয়াদ আরো বাড়াতে পারি?"

—"সম্ভব।"

—"তার ফলে আমাদের দেহের আর মনের স্বাস্থ্য এখনকার তুলনায় বেশি ভালো হবে তো?"

—"আশা করা যায় তাই হবে।"

—"ওই আশা নিয়ে আমাদের কর্মীরা কাজ করে বলে কাজ কারু কাছে বোঝা হয়ে ওঠেনা।"

কথা বলতে বলতে আমাদের গাড়ি পীস-রোডে গিয়ে পড়ল। আমি চমকে উঠলাম। দু'পাশে সারি-সারি চারতলা-পাঁচতলা দোকান। নানা রংয়ের নিয়ন লাইট-সাইন। কলকাতায় চার-পাঁচটা চৌরঙ্গী ওই একটা রাস্তায় পুরে ফেলা যায়। দোকানগুলোয় কী ভিড়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমাদের কোন উৎসব আছে নাকি আজ?"

—"না তো।"

—"এত ক্রেতা কোত্থেকে এলো?"

—"কোন বিদেশ থেকে নিশ্চিতই আসেনি।"

—"ওরা কারা?"

—"দেখে কি ভারতীয় মনে হচ্ছে?"

—"না।"

—"ইউরোপীয়ান কি আমেরিকান?"

—"তাই বা বলি কি করে?"

—"চীনা মনে হচ্ছে কি?"

—"তাই তো মনে হচ্ছে।"

—"কোন ভুল হয়নি আপনার।"

—"কিন্তু ওরা কারা, মানে, কোন স্তরের লোক?"

—"দেখুন, আমাদের দেশে সম্রাট নেই, রাজা নেই, জমিদার নেই, উকিল নেই, দালাল নেই—আছে শুধু ওয়াকার্স। বেচতেও তারা, কিনতেও তারা। কেনবার লোক বেড়ে গেছে। লোকের ক্রয়শক্তিও বেড়ে গেছে। তাই দোকানে দোকানে অত ভিড়। দেশটা যে পঞ্চাশ কোটি মানুষের দেশ, তা ভোলেন কেন?"

—"ক্রয়শক্তি এমনই বেড়েছে?"

—"কেউ ধারে কিনছে না! বড় বড় দোকানগুলি ডিপার্টমেণ্ট স্টোর্স। কোনটা পুরোপুরি গবর্নমেণ্টের, কোনটা আধা-পাবলিক আধা-প্রাইভেট, কোনটা পুরোপুরিই ব্যক্তি-সম্পত্তি। আজকাল দর্জির কাছে জামার অর্ডার দিয়ে তা পেতে মাস-দুই সময় লাগে, দর্জিরা এতই অর্ডার পায়। ডিপার্টমেণ্ট স্টোর্স পাইকারি হারে জামা কাপড় তৈরি করে। তাই পাওয়াও যায় প্রচুর, দাম পড়েও কম। আসলে কিন্তু নাপিতের আর দর্জির দোকান থেকেই একটা জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝা যায়। পকেট খালি থাকলে কেউ ঘন-ঘন চুলও ছাটে না, দর্জির দোকানে অর্ডার দিয়ে জামা-কাপড়ও তৈরি করায় না। আমাদের দর্জিরাও দিবারাত্র কাজ করছে, ডিপার্টমেণ্ট স্টোর্সগুলিও ভিড় কমাতে পারছে না।"

আমি চুপ করে রইলাম।

—"ভাবছেন কি?"

—"তোমার কথাগুলো।"

—"অন্যায় বলেছি কিছু?"

—"খুব বড় কথা খুব সহজ করে কি করে বললে তুমি তাই ভাবছি।"

—"কথা বড় বল্লাম, কি ছোট বল্লাম, তা জানিনা, তবে দৃষ্টি আর মন দুই-ই আমাদের এমন হয়েছে যে জাতিকে বুঝতে হলে আমরা ওই দৃষ্টি-কোণ থেকেই দেখি।"

—"তোমাদের এই দেখাই সত্যিকারের দেখা এবং তোমাদের আজকার দেশকে দেখে যে গৌরব তোমরা অনুভব কর, সত্যিই তাই নয়া-চীনের গৌরবের বিষয়।"

তিনজিন থেকে আমরা ত্যানকিং যাই। যে-দিন বিকেলে গিয়ে পৌছি, সেইদিন সন্ধ্যাতেই স্থানীয় পীস-কমিটি অভ্যর্থনা-ভোজের আয়োজন করেন। আমার টেবিলে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মাঝে ছিলেন অভিনেত্রী ইয়েন-চেন। তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় তখনো পাইনি। তিনি বল্লেন—"ভারতীয় অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

—"তাদের কথা জানতে ইচ্ছে হলো কেন?" জিজ্ঞাসা করলাম।

—"হবে না, আমরা একই পথের পথিক, একই শিল্পের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্ম-প্রকাশ।"

এই কথা, চিন্তাধারার এই বিশেষ গতিই লক্ষ্য করবার বিষয়। কেবল কৌতূহলই নয়, শিল্পী বলেই শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর একাত্ম-বোধ। এইটেই বড় কথা।

পরে তাঁর অভিনয় দেখি। সে-কথা অন্যত্র বলেছি। যা বলিনি তা হচ্ছে তাঁর এই উক্তি—"গর্কির 'মা' তো অভিনয় করবই—দেখবেন আমি একদিন বাংলা নাটকও অভিনয় করব।"

করবেন, কি করবেন না, সে-কথাও বড় কথা নয়—বড় কথা মনের বিস্তার। সব দেশের সব শিল্পীই আমার পরমাত্মীয়, সব নাটকই রূপায়িত করা আমার স্বধর্ম—এই যে অনুভূতি, এই তো বড় কথা। সময় আর সুযোগ এর পরবর্তী কথা। তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি

নির্ভরশীল। পৃথিবীর সকল শিল্পীর প্রতি, শিল্পের প্রতি, এই আকর্ষণ নয়া-চীনের তরুণ-তরুণী শিল্পীদেরকে ব্যাপক দৃষ্টি দিয়েছে।

সাংহাইয়ের আর্ট ও কালচার এসোসিয়েশনের সম্পাদক বয়েসে নবীন কিন্তু চিন্তার গভীরতায় অত্যন্ত প্রবীণ। চীনের নাট্য-প্রগতি আমাদের নাট্যোলোচনা-সেমিনারে অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন এবং আমাদের আলোচনা থেকে বর্তমান ভারতের নাট্যধারাটি সম্যক্ উপলব্ধি করলেন। আমাদের পেশাদার মঞ্চ এবং গণনাট্য সম্প্রদায় কে কি ভাবে, কোন্ কোন্ অসুবিধার ভিতর দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তা যেমন বুঝলেন, তেমন স্বীকারও করলেন দুয়েরই পিছনে রয়েছে নাট্যকার ও অভিনেতৃদের অমূল্য অবদান। ভারতীয় কোন নাটক পড়বার কি তার অভিনয় দেখবার সুযোগ যদিও তাঁদের হয়নি, তবুও আমাদের আলোচনা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, নাট্যশিল্পে আমরা আদৌ অনুন্নত নই। তিনি আশা প্রকাশ করলেন—"বছর কয়েকের মাঝেই আমরা ভারতীয় নাটকের চৈনিক-রূপ দেখতে পাব। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়েছে।"

এখানেও পেলাম মনের বিস্তারের পরিচয়—নয়া-চীনের তরুণ-তরুণীর মনের।

সাংহাই পীস-কমিটির সেক্রেটারি-জেনারেল সু পি-ইয়াকে ঠিক তরুণ বলা যায় কিনা বয়েসের হিসেবে, তা বলতে পারিনা। কিন্তু আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে তাঁর তারুণ্যের ছাপ সুস্পষ্ট। কথা বেশি বলেন না, কিন্তু যখনই বলেন সর্ব মানুষের প্রতি দরদ ফুটে ওঠে। হাসি মুখে মাখানো কর্ম-প্রবণতাও কম নয়। সাংহাইয়ের জন্য গরবও খুব। সাংহাইকে পশ্চিমের শক্তিপুঞ্জ এককালে নরক-কুণ্ড করে তুলেছিল। সাংহাইতে অত্যাচারী স্বদেশী শক্তির তাণ্ডব লীলা

চলেছিল। আবার সেই সাংহাইতেই সর্বপ্রথম শ্রমিক-শক্তির জাগরণ দেখা দিয়েছিল। সাংহাইতেই চীন কমিউনিস্ট পার্টি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সাংহাইতেই লু-স্যুন,—চীনের ম্যাকসিম গর্কি,—তাঁর অমর সাহিত্য রচনা করেন, সান ইয়াত-সেন এবং চেয়ারম্যান মাও সাংহাইকেই প্রথম কর্ম-কেন্দ্র করেন।

বিদেশীদের অপসৃতির পর সাংহাইয়ের বিদেশী-রচিত নরক বিলুপ্ত হয়েছে, আগেকার জুয়াখেলার আড্ডায় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে, ঘোড়-দৌড়ের মাঠ পিপলস্ পার্কে রূপান্তরিত হয়েছে, বিদেশীদের হোটেলকে ওয়ার্কার্স প্যালেসে পরিবর্তিত করা হয়েছে। যে সাংহাই একদা শ্রমিকদের কবরখানায় পরিণত হয়েছিল, সেই সাংহাই আজ শ্রমিকদেরই ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়াসে শ্রমিকদের স্বর্গ হয়ে উঠছে। পিকিং যখন নিষিদ্ধ নগরী ছিল, সাংহাই তখন জাতির প্রাণশক্তি ধারণ করেছিল, বহন করেছিল—আর আজ পিকিং পিপল্‌স্ রিপাবলিকের কেন্দ্র হয়ে সাংহাইয়ের প্রাণবত্তা ও কর্মতৎপরতা হরণ না করে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেই চলেছে। সু পি-ইয়া এই সব স্মরণ করিয়ে দিতে যে গৌরব অনুভব করেন, তাতে প্রাদেশিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় অনাবিল দেশপ্রেম, মানব-প্রীতি। নয়া-চীনের নতুন নর-নারী আমার মনে এই মনোরম স্থানই পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে যদি আমাদের সঙ্গে যে তরুণ ডাক্তার আর তরুণী নার্স সদা-সর্বদা থাকতেন, তাঁদের সেবা-নিষ্ঠার কথা না বলি, তাহলে অন্যায় হবে। সকালে উঠে ঘরে-ঘরে তাঁরা তো রুগীর সন্ধানে ঘুরতেনই, তা ছাড়া আমরা যখন কোনো জায়গা দেখতে যেতাম, ফার্স্ট-এইডের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে তাঁরাও সঙ্গে-সঙ্গে থাকতেন। আমাদের প্রথম ডাক্তারটির ক্ষোভ ছিল প্রতিনিধি-নেতার সেবা করবার সুযোগ

তিনি পেলেন না বলে। সেবা করবার উৎসাহ তাঁর এতই বেশি যে, কারণে-অকারণে দৌড়-ঝাঁপ করে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি গেলেন হাসপাতালে, আর আমাদের সেবা করবার জন্য এলেন অন্য ডাক্তার। নার্সটি শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন।

আর বলবার কথা রয়েছে সেই সব তরুণ-কর্মীদের সম্বন্ধে যাঁরা ট্রেনে আমাদের পরিচর্যা করতেন—ডাইনিং কারের কর্মীরা আর ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণের কর্মীরা। তাঁরা রেলওয়ে শ্রমিক। এক নাগাড়ে একবার তিনদিন এবং আর একবার চারদিন আমরা ট্রেনে কাটিয়েছি। কিন্তু প্রয়োজনীয় কোন কিছুর অভাব কখনো অনুভব করিনি। পনেরো মিনিট বিশ-মিনিট অন্তর কেউ না কেউ কামরায় এসে দেখে যাবে আমাদের পানীয় জল ফুরিয়ে গেছে কিনা, সিগারেটের প্যাকেট শূন্য রয়েছে কিনা, লজেঞ্চ-টফির প্লেটটা আমরা খালি করে ফেলেছি কিনা। রাত্রে দুটি কর্মী পালা করে করিডোর পরিক্রমা করত, কারু কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা তাই দেখতো। মাছি মারবার জন্য যে লোকটি নিযুক্ত ছিল, বেতের ডগায় চামড়ার পটি লাগানো যন্ত্র হাতে নিয়ে সর্বদা সে ঘুরে বেড়াতো। মাছিগুলো আমাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে উড়ে বেড়াতে পারত, কিন্তু তার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারত না। আমরা পরমানন্দে গল্প করছি, সহসা সে কামরায় ঢুকল, সপাং শব্দ হোলো তার বেতের, মৃত মাছিটা তুলে নিয়ে যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল, তেমনই নিঃশব্দে চলে গেল। বিপুলকায় প্রধান পাচকটি কতরকমই না এক্সপেরিমেণ্ট করত আমাদের রুচিকর খাবার তৈরি করতে। খেয়ে আমরা খুশি হলে আমাদের চেয়েও খুশি হোতো সে। পরিবেশন যারা করত, তারা খুবই অল্প বয়েসের ছেলে। আমাদের ডেলিগেটদের আমিষ-নিরামিষ ভাগটা রোজই সমান থাকত

না; কোনদিন আমিষ-ভোজীর সংখ্যা বেড়ে যেত, কোনদিন নিরামিষ-ভোজীর। পরিবেশকরা মুশকিলে পড়ত। কিন্তু মুশকিলটা যে কত জটিল, তা মুশকিল যাঁরা ঘটাতেন, তাঁরা বুঝতে পারতেন না—মাদাম কু, পাচক পরিবেশকরা পরামর্শ করে সবাইকেই রুচি অনুযায়ী খাইয়ে দিতেন।

আমরা যখন যে শহরে যেতাম, ট্রেনটি সেই শহরের স্টেশনেই থাকত। তিন-চার দিন পর অন্যত্র যাবার জন্য আবার যখন স্টেশনে ফিরে আসতাম, তখন ট্রেনের এই কর্মীরা এমন হেসে আমাদেরকে অভ্যর্থনা করত যে, মনে হোতো, প্রবাসী প্রিয়জনের প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়েই যেন তারা দাঁড়িয়ে আছে। কেবল আদেশ পালনের দায়ে কি চাকুরি রক্ষার প্রয়াস চিত্তে সে-ভাব সঞ্চার করতে পারেনা। তারও চেয়ে অতিরিক্ত কিছু ওদের মনে কাজ করত। হয়ত তা পরম্পরা-প্রাপ্ত সংস্কৃতি। এতদিন তা অবচেতন লোকে অপ্রকাশিত ছিল, আজকার গণমুক্তি আবার তাকে প্রকাশিত করেছে।

হ্যাঙচোতে আমাদের দুবার যেতে হয়। একবার আমাদের সাধারণ প্রোগ্রাম পালন করতে যাই, আর একবার যাই বাধ্য হয়ে। প্রথমবার হ্যাঙচো ছাড়বার একদিন পরে আমাদের ট্রেন একটি স্টেশনে হঠাৎ থেমে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টার পরও যখন ট্রেন অচল রইল তখন সন্ধান নিয়ে জানলাম বিগত দিবসের টাইফুনের ফলে বিষম বন্যা হয়েছে, সামনের লাইন ভেঙে গেছে, টেলিগ্রাফিক সংযোগও বিচ্ছিন্ন। অবস্থাটা চাক্ষুষ দেখবার জন্য স্টেশন স্টাফের লোক গেছে। তারা ফিরে এলে জানা যাবে ট্রেন আমাদের কখন ছাড়বে। টাইফুনের আভাষ আমরা হ্যাঙচোতে পেয়ে এসেছিলাম। তার সম্ভাবনা রয়েছে বলে হ্যাঙচোর সুবিখ্যাত হ্রদে আমাদের নৌ-বিহারের প্রোগ্রাম রদ করে দেওয়া হয়েছিল। সারাদিন এবং রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা

করবার পর জানা গেল লাইন সংস্কার করবার জন্য লোকজন যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে ; কিন্তু জল না নামায় কাজ শুরু করতে পারেনি। জল আর বাড়েনি কিন্তু নামেওনি। ওই পথ দিয়ে ক্যানটন পৌছুতে সময় লাগত কম। সময়ে ক্যানটনে পৌছুতে না পারলে হংকংয়ে প্লেন ধরবার তাগিদে ক্যানটনে আমরা অভিনয় করতে পারবনা। অথচ চীনে ঢুকে সর্বপ্রথমেই আমরা ক্যানটনের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের ঘুরে ক্যানটন যেতে হবে। কিন্তু তার জন্য রেলের তিনটি বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে আমাদের স্পেশ্যালকে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে ক্যানটনে পৌছে দিতে পারেন। মিঃ উ দমবার পাত্র আদৌ নন। তার ব্যবস্থা করতে এবং আমাদের জন্য অতিরিক্ত রসদ সংগ্রহ করতে আমাদের হ্যাঙচোতেই আবার ফিরে যেতে হবে, জানালেন তিনি।

আমি বল্লাম—"মন্দ কি! টাইফুনের ঘনঘটা কেটে গেছে, হ্রদে নৌবিহার আমাদের ভাগ্যে লেখা রয়েছে।"

—"আর একটা অপেরা দেখাও।" দেবব্রত বল্লেন।

প্রথমবারে হ্যাঙচোতে যে লোকো অপেরাটি আমাদের দেখানো হয়েছিল সেটি আমাদের এত ভাল লেগেছিল যে, আমরা ওই রকম আর একটি অপেরা দেখবার সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্য বলেই মনে করেছিলাম।

হ্যাঙচোয় ফিরে গেলাম সকাল বেলায়। যাঁরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ট্রেনে উপস্থিত ছিলেন, আমরা ট্রেন থেকে নামতেই তাঁরা হো-হো করে হেসে উঠলেন—ভাবটা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলে, তাই আবার ফিরে আসতে হোলো। হোটেল কম্পাউণ্ডে ঢুকে দেখি হোটেলের মেয়ে-পুরুষ কর্মীরা সারি বেঁধে

দাঁড়িয়ে আছেন। যেমন গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়িতে পা দিলাম—অম্নি তাঁরা সকলে একসঙ্গে হেসে উঠ্‌লেন।

আমি বল্লাম—"হ্যাঙচোই ভারতীয়দের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। তারই প্রীতির টানে ফিরে এলাম।"

শুনে এবং মর্ম বুঝে সবাই খুব খুশি হোলেন। প্রধান কর্মী জানালেন—"তোমাদের প্রাতরাশ তৈরি করে রেখেছি।"

—"প্রীতি দিয়েই তো অনশন ভাঙালে।" বলে উপরে উঠে গেলাম।

হ্যাঙচোকে চীনের ভূ-স্বর্গ বলা হয়। সত্যাই যেন ভূ-স্বর্গ। পাহাড়ে-হ্রদে-শ্যাম বনানীশ্রেণীতে আর ঘন-নীল অম্বরে মিলে এক অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তার ওপর চীনের অমর শিল্পীরা পাহাড়ের বুকে বুকে গড়ে তুলেছেন স্বপন-পুরী, হ্রদের দ্বীপে দ্বীপে সৃষ্টি করেছেন মায়া-কানন। কোন্ সংসার-বিরাগী বীর মানুষের বিশ্বাস-ঘাতকতায় পীড়া পেয়ে হ্রদের দ্বীপের এক নির্জন প্রান্তে কুল-ফুল আর সারসকে জীবনের সাথী করে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন তাও যেমন সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে, তেমনই উনিশ শ এগারো সালে সান ইয়াত-সেন কু-সেন পাহাড়ে যে বিপ্লবের বাণী প্রচার করে বলেছিলেন—"পৃথিবীর সকল মানুষ সুদৃঢ় ঐক্যে আবদ্ধ হয়ে অজেয় হোক", তাও উৎকীর্ণ রাখা হয়েছে। আট-শ বছর আগে যে স্বদেশ-প্রেমিক দেশকে রক্ষা করবার পর বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা সবংশে নিহত হয়েছিলেন, তাঁর প্রতিমূর্তি এবং স্মৃতি-মন্দির হ্যাঙচোবাসীরা যেমন সযত্নে রক্ষা করেছে, তেমন সেই বিশ্বাসঘাতকদের প্রতীকও রক্ষা করেছে—দলে দর্শকরা আজও যার ওপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি অন্তরের ঘৃণা প্রকাশ করে।

হ্যাঙচোতে দুটি মীন-সরোবর আছে। একটির স্ফটিকস্বচ্ছ জলে

খেলা করে বেড়ায় নানা বর্ণের ছোট-বড় নানা জাতীয় মাছ আর একটিতে শুধু অগ্নি-বর্ণের। প্রথমটি যখন দেখতে গেলাম, তখন আমাদের প্রত্যেকের হাতে দেওয়া হলো এক একখানি চায়ের সসার-ভর্তি মিঠে-কুমড়ার টুকরো, আর দ্বিতীয়টি যখন দেখতে গেলাম তখন দেওয়া হলো আটার রুটি—মাছগুলোকে খাওয়াবার জন্য। তাদের সে খাওয়া দেখা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ছেলে-মেয়েরা ছুটির দিনে দলে দলে মৎস্যকুলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়।

ইয়েলো-ড্রাগন কেভ, লামা-টেম্পল ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে আমার মনের পটে কেন যেন ফুটে উঠ্‌ল বহু অতীতের বৌদ্ধ বিহারের শ্রুত-স্মৃতি। আমি যেন দেখতে পেলাম পীত চিবর পরিহিত শত শত শ্রমণ গুহায় গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন, শিক্ষার্থীরা গুহা-আবাস থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথ বয়ে নেমে এসে আচার্যের আসন-বেদীতলে একে একে উপবেশন করছেন। এখুনি হয়ত শ্বেত-রক্তিম উৎপল শোভিত অপরিসর ওই কৃত্রিম সরসী পরিক্রমা করে পায়ে পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে আচার্যদেব আসন পরিগ্রহ করবেন, হয়ত এখুনি ধ্যান-গম্ভীর এই গিরিপুরীর অমর আত্মা যুগ-যুগান্তের নীরবতা ভঙ্গ করে শত শত শ্রমণ ও শিক্ষার্থীদের উদাত্ত-কণ্ঠের প্রতিধ্বনি তুলবে—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি।"

হ্যাঙচো পীস-কমিটির সেক্রেটারি বল্লেন—"কি ভাবছেন অত ?"

—"ভাবছি না, স্বপ্ন দেখছিলাম। মনোরম স্বপ্ন।',

—"আমরা বাস্তববাদী, স্বপ্ন দেখিনা।" বল্লেন তিনি।

—"আপনি না দেখতে পারেন, কিন্তু আপনাদের নায়করা নিশ্চিতই দেখেন। নইলে হ্যাঙচোর এ-রূপ তাঁরা আজ পাল্টে দিতেন। এ যে লোকোত্তরের দিকে মনকে ঠেলে দেয়।"

সম্পাদক মশাই আমার কথা বুঝলেন কিনা, তা জানবার কৌতূহলও আমার হোলো না। কেননা চীনে যতদিন ছিলাম, কারু মুখে একদিনও ভগবান শব্দটি শুনিনি, আধ্যাত্মিকতার অভিজ্ঞতা ও সাধনা বলে কিছু যে আছে তাও কারু মুখ থেকে নিঃসৃত হতে শুনিনি। অথচ হ্যাঙচোর ইয়োলো ড্রাগন কেভ অপরিবর্তিত রয়েছে, প্লাম এণ্ড স্টর্কের কিংবদন্তী স্তব্ধ করে দেওয়া হয়নি। কর্মব্যস্ত আজকার চীনে হ্যাঙচো একটি পরম বিস্ময়। হ্যাঙচো বাস্তব, চৈনিক জীবনেও বাস্তব। নইলে হ্যাঙচো নবীন চীনেরও গৌরবের বস্তু হয়ে থাকত না, হ্যাঙচোর লোকো-অপেরা আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পিকিং অপেরা থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে পারত না। দুই অপেরার পার্থক্য লক্ষ্য করবার বিষয়।

আমার আশে-পাশে আমাদের কয়েকজন ডেলিগেট এবং দোভাষী জড়ো হয়েছিলেন। তাদেরকে আমি বল্লাম—"হয়ত এখানে একদিন খুব বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তক্ষশীলা, নালান্দার মতো। হয়ত শীলভদ্রের মতো কোন কোন ভারতীয় আচার্যের পদধূলি এখানে পড়েছিল। ইতিহাস থেকে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে কস্মিন-কালেও এখানে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিলনা, তাহলেও আমি বলব বিশ্ব-শান্তির একটি বিশ্ববিদ্যালয় এমনই একটি জায়গায় হওয়া একান্তই প্রয়োজনীয়। এই পরিবেশে এসে বাস করবেন দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠতম সেই আচার্যরা, যাঁরা বিশ্ব-শান্তি কামনা করেন। দেশ-বিদেশের তরুণ-তরুণীরা এইখানে এসে সেই আচার্যদের কাছে পাঠ নেবেন অহিংস জীবন দর্শনের, নির্লোভ অর্থনীতির, নিরহঙ্কার আত্মোপলব্ধির। এখানকার গিরিগাত্রে শান্তি, হ্রদে শান্তি, বাতাসে শান্তি, ওষধিতে শান্তি, ক্ষিতিতে শান্তি, ব্যোমে শান্তি। এই পরিপূর্ণ শান্তির আবহে থেকে শিক্ষার্থিরা শান্তিকে যে-ভাবে জীবনের আদর্শের সঙ্গে জড়িয়ে

নিতে পারবে, তার ফলেই প্রতিষ্ঠা পাবে বিশ্বশান্তি। যে উত্তম দিয়ে নয়াচীন দেশকে শিল্পান্বিত করতে চাইছে, সেই উত্তম দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে যদি অবশিষ্ট এমনই সব পরিবেশে সে শান্তি-বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলে, তাহলে কেবল তারই কল্যাণ হবে না, বিশ্বেরও হবে মঙ্গল। নয়া-চীন তা একেবারে অবিশ্বাস করে না বলেই আমার ধারণা। যদি করত, তাহলে হ্যাঙচোর হ্রদের পাশে সে শ্রমিকদের জন্য স্যানাটোরিয়াম গড়ত না, আর গড়ল যদি তাহলে ইয়োলো ড্রাগন কেভ আর এই লামা মন্দির ভেঙে ফেলে রেস ফ্যাক্টরিই গড়ত, লোকোত্তরের চিন্তা মনে জাগাতে পারে এমন কোন স্থান সে রাখত না। কিন্তু নয়া-চীন লোকোত্তরের সন্ধানে নারাজ এ-কথা আমার মনে হয় না এই কারণেই যে, সে তার তরুণ-তরুণীদের চু-ইউয়ানের কবিতা পড়ায়, ফিউডালিজম-এর সহায়ক ছিলেন বলেই কনফুসাসের অবদান অগ্রাহ্য করতে বলে না, পিকিং অপেরার ঐতিহ্যকে সেকেলে বলে বর্জন করে না, সকল আর্ট ও সাহিত্যকে চৈনিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক করে তরুণ-তরুণীর চিত্তে পরম্পরা-প্রাপ্ত ভাব-সম্পদ সঞ্চারিত করতে দ্বিধাবোধ করে না। নয়াচীন পুরাতনের প্রতি চ্যালেঞ্জ নিয়ে দাঁড়ায়নি, দাঁড়িয়েছে পুরাতনকে নবরূপ দিতে।

আমাদের প্রতিনিধিদলের যাঁরা এ-সব কথা শুনছিলেন, তাদের মনের প্রতিক্রিয়া জানবার ঔৎসুক্য আমার বিশেষ ছিল না, কৌতূহল ছিল নয়াচীনের তরুণ-তরুণী শ্রোতৃরা আমাকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করেন কিনা তাই জানবার। তাদের মুখ দেখে কিছু বুঝলাম না, মুখ ফুটে কেউ কিছু বল্লেনও না তাঁরা। অন্য সময়ে অন্যত্র এমনই কথা বলে দেখেছি তাঁদের মুখে অবিশ্বাসের হাসি। কিন্তু হ্যাঙচোর এই পরিবেশে সেই অবিশ্বাসের হাসিও তাদের মুখে দেখলাম না।

শান্তি কমিটি

যেদিন পিপল্‌স্ গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, ঠিক তার পরের দিন, অর্থাৎ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে সর্বদলের প্রতিনিধি নিয়ে সারা চীন পিপল্‌স্ পীস কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কথা বিশেষ করে বলছি এই কারণে যে, দেশকে শত্রু-কবল থেকে মুক্ত করেই নয়া-চীন শান্তির প্রতিষ্ঠাকেই সবচেয়ে কামনার বিষয় বলে মনে করে—যেমন বিশ্ব শান্তি, তেমন আভ্যন্তরীন শান্তি। কেননা নয়াচীন উপলব্ধি করে যে, ঘরে-বাইরে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে নব-সংগঠনের কোন প্রয়াস সার্থক হবে না।

ক্যানটন থেকে ট্রেনে পিকিং যাবার পথে ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করেছি, আর দেখে বিস্মিত হয়েছি ষ্টেশন-গৃহ, কর্মীদের আবাস, প্লাটফর্ম, সবই নতুন তৈরি। একদিন লিয়াজঁ অফিসার মিঃ উকে জিজ্ঞাসা করে ফেল্লাম :

—"এই রেলপথটি কি নতুন তৈরি হয়েছে ?"

—"নতুন হবে কেন !"

—"ষ্টেশনের বাড়ী-ঘর প্লাটফর্ম সবই যে নতুন দেখছি।"

—"ও-সব তো নতুন করেই তৈরি করতে হয়েছে।"

—"কেন ?"

—"একদফা জাপানীরা পালাবার সময় বোমা ফেলে ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল, আর একদফা চিয়াংকাইশেক।"

সত্যিই তো। লিবারেশনের আগেকার এগারো বছর চীনকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে হটাতে হয়েছে, চিয়াং-কাইশেককে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করতে হয়েছে। যাবার সময় তারা যা পেয়েছে ধ্বংস করে গেছে—রেল-লাইন, রাস্তা, কারখানা, শহর। এমন কি ক্যানটনের বিখ্যাত সাই-ইয়াত-সেন মেমোরিয়াল হলটির ওপারও জাপানীরা বোমা ফেলে গিয়েছে। কলকাতায় জাপানী বোমা শুধু তর্জন-গর্জনই করে গেছে, ধ্বংস কিছু করে যেতে পারেনি। তাই যুদ্ধের তাণ্ডবের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি। শত্রুকে তাড়াবার পরই যে প্রথম কাজ পুনর্গঠন, সে-কথা আমাদের মাথায় সহজে ঢোকবার কথা নয়।

আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে মিঃ উ বল্লেন—"এই জন্যই তো আমরা শান্তি চাই—ঘরে শান্তি, বাইরে শান্তি। কত কিছু আমাদের গড়ে তুলতে হবে! আর একটা যুদ্ধ বাধলে কিছুই গড়বার অবসর পাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি শিল্প গড়ে তুলতে না পারলে পঞ্চাশ কোটি নর-নারীকে বাঁচানো যাবে না, প্রতিষ্ঠা দেওয়া যাবে না। তাই তো আমাদের নায়করা যেদিন পিপ্‌লস্‌ গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করলেন, তার পরের দিনই শান্তি কমিটির প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য মনে করলেন।"

বুঝলাম শান্তি কমিটি ওঁদের শৌখিন প্রতিষ্ঠান নয়, প্রয়োজনের তাগিদেই সৃষ্টি হয়েছে। পিপলস রিপাবলিকের ভাইস-প্রিমিয়ার, ঐতিহাসিক ও নাট্যকার কুয়ো মো-জো ওর চেয়ারম্যান—ভাইস চেয়ারম্যান কুন চেন আর চেন চু-চুঙ। আমরা এই কমিটির আমন্ত্রণে চীনে গিয়াছিলাম নিখিল ভারত শান্তি-সংসদের পক্ষ থেকে। কমিটি যে রাজকীয় অভ্যর্থনা আমাদের দিয়েছিলেন, আমাদের আরামে

রাখবার যে-ব্যবস্থা করেছিলেন, যে-সব মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে আমি কমিটির নায়কদেরকে বলতাম—"দেশের রাজপুত্র-রাজকন্যাদেরকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে বিদেশের উনত্রিশটি নর-নারীকে রাজপুত্র-রাজকন্যার স্থানে বসিয়ে আপনাদের কী লাভ হচ্ছে বুঝতে পারছি না।" মৃদু হেসে তাঁরা বলতেন—"শান্তির দূতদের আমরা নয়নের মণি বলেই মানি।"

—"শান্তি! আর্ত পৃথিবীতে কোথায় শান্তি?" বলতাম আমি।

—"আমাদের মৈত্রীর মাঝে।" জবাব শুনে হতবাক্ হতাম। মনে হোতো ওকি শুধুই মামুলি শিষ্টাচার, না সত্যই ওঁদের প্রত্যয়ও ওই? আবার ভাবতাম ওঁরা রাষ্ট্র-নায়ক, ওঁদের হয়ত বা কিছু রাজনীতিক অভিসন্ধি আছে, কিন্তু পথে ঘাটে, পার্কে, কারখানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব তরুণ-তরুণী আমাদেরকে দেখতে পেলে 'ইন্দো ইন্দো' গুঞ্জন তুলে হাসিমুখে আমাদেরকে ঘিরে দাঁড়ায়, তারা তো নিশ্চিতই কোন অভিসন্ধি নিয়ে আসে না। তারা তো প্রীতি দিয়ে, প্রীতি নিয়ে, প্রীতিরই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তারা তো কোন কূটনীতির ধার ধারে না। ভাবতাম মানব-সভ্যতার নবরূপের আভাস নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে এইসব তরুণ-তরুণী সমুদ্রমন্থনজাত মানব-প্রীতির অমৃত-কুম্ভ বহন করে। ভাবতাম ওই সব। কিন্তু তা মেনে নিতেও যেন বাধত।

একদিন লিয়াজঁ অফিসার মিঃ উ-কে বল্লাম—"আচ্ছা আপনারা সত্যিই তো শান্তি চান, বিশ্বশান্তি?

—"চাই বৈ কি।"

—"তবে যুদ্ধের ভাষায় শান্তির কামনা প্রকাশ করেন কেন?"

—"যথা?" জানতে চাইলেন তিনি।

আমি বল্লাম—"আপনারা শান্তি 'পেতে' চান না, 'সংগ্রাম' করে

'জয় করে' নিতে চান। শান্তি কর্মীদেরকে আপনারা বলেন 'যোদ্ধা', তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করাকে বলেন 'সমাবেশ' করা। শান্তির দাবিকে জোর দেবার তাগিদ উদ্দেশ্যে আপনারা হাঁক দেন 'অভিযান' করবার জন্য। সবই যুদ্ধের ভাষা। বলা কি যায় না যে আপনারা ভাবেন যুদ্ধ, বলেন শান্তি ?"

—"বলেন যদি, ভুল বলবেন।"

—"ভুলটা বুঝিয়ে দিন।"

—"শান্তির কামনা মানুষের স্বাভাবিক কামনা। শান্তির ভিতর দিয়েই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই শান্তি হরণ করে নিয়েছে যুদ্ধবাজরা। তারা যদি বীজাণু-বোমা, নাপাম বোমা, এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ফেলতে থাকে, তাহলে আমাদের শত আবেদন-নিবেদনের ফলেও শান্তি আসবে না। তাই তো শান্তির কথা ভেবেই 'সংগ্রামে'র কথা ভাবতে হয়, 'সমাবেশ' করতে হয়, 'জয়' করবার প্রেরণা জাগাতে হয়। যুদ্ধবাজদেরকে পৃথিবীর শান্তি অটুট রাখতে বাধ্য করাতে পারলেই পৃথিবীর মানুষ শান্তি পাবে, নইলে নয়।"

—"কিন্তু লড়াই করতে চাইলে যুদ্ধবাজরাও তো লড়াই করবে।"

—"করবে। না চাইলেও তারা যুদ্ধ করবে। কোরিয়াতে তারা বর্বরতার চরম পরিচয় দিয়েছে আপনারা জানেন। চীনের জনগণ যদি চুপ করে থাকত, তাহলে উত্তর কোরিয়াকে ম্যাপ থেকে মুছে ফেলে দিয়ে তারা চীনেরও ক্ষতি করতে অগ্রসর হতো। চীনের গণ-স্বেচ্ছাসৈন্যরা যদি এগিয়ে না যেত, তাহলে যুদ্ধ-বিরতি হোত না। যে কারণে যুদ্ধ-বিরতি সম্ভবপর হয়েছে, সেই কারণে স্থায়ী শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হতে অবশ্যই পারবে।

—"কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের উত্তেজনা জাগিয়ে তুল্লে তো যুদ্ধই হবে।"

—"যুদ্ধবাজরা যদি অজেয় থাকে তাহলে চিরকালই তারা যুদ্ধ করবে। যুদ্ধবাজরা পৃথিবীর মানুষকে শোষণ করবার জন্যই দুর্বল করে রাখতে চায়, দৈন্যের পাকে ডুবিয়ে রাখতে চায়, পৃথিবীর সর্বত্র তারা যুদ্ধের আগুন জ্বেলে তোলবার নতুন নতুন কারণ সৃষ্টি করে। শান্তির আওয়াজকে বড় করে তুল্লে যুদ্ধবাজদের দেশের লোকরাও বুঝতে পারবে যুদ্ধের প্রয়োজন সত্যই কিছু নেই। মিথ্যা একটা প্রয়োজন খাড়া করে যুদ্ধবাজরা তাদের দেশের সৃষ্টিধরদেরকে কামানের খোরাক করে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি করছে। কোন্ দেশ কমিউনিস্ট হোলো, কোন্ দেশ সোশ্যালিজম গড়ে তুল্ল, তা নিয়ে যুদ্ধবাজদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন তো কিছুমাত্র নেই। তারা তাদের দেশের কথা ভাবুক। আমরা তাদের কোন সাধে বাদ সাধতে যাব না। কিন্তু তারা জানে পিপল্স্ রিপাবলিক যদি টিকে থাকে, তাহলে সারা পৃথিবীর জনগণ এইসব রিপাবলিকের দৃষ্টান্ত দেখে নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপ পরিবর্তন করতে চাইবে। ভয়টা তাই। ভয়টা জন-জাগরণের। তাই পিপল্স্ গবর্নমেণ্ট যে-যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই-সেই দেশগুলিকে ওই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিদারেরা, ওই যুদ্ধবাজরা, ধ্বংস করতে চায়। আমরা যদি কাতর কণ্ঠে অনুনয় বিনয় করে বলি, ওগো, মানবতার খাতিরে আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দাও, ওরা তা শুনবে না নিশ্চিত জানি। তাই শান্তির জন্য আমাদেরকে 'লড়াই' করতে হয়, শান্তি 'জয়' করবার সঙ্কল্প নিয়ে কর্মী 'সমাবেশ' করতে হয়, 'অভিযান' করবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়।"

—"উত্তর কোরিয়ায় কি চীনের গণ-স্বেচ্ছাসৈন্য সেই জন্যই পাঠিয়েছেন?"

—"হ্যাঁ, শান্তি রক্ষা করতে। যদি আমরা সফল না হতাম,

তা হলে যে জীবাণু বোমা তারা ফেলা শুরু করেছিল, তার ফলে এই চীন-পরিভ্রমণে এসে আপনারাও নিরাপদ থাকতে পারতেন না। চীনের সীমানায় তারা তো বোমা ফেলেছিল।"

বুঝতে পারলাম চীনের শান্তি কমিটি কোন্ দৃষ্টি-কোণ থেকে বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বশান্তিকে দেখছেন। মনে মনে মেনে নিলাম মৃতের শান্তি না চেয়ে জীবিত থেকে শান্তি চাইলে শান্তি-আন্দোলনকে আক্রমণাত্মক করেই তুলতে হয়। অবশ্য সে আক্রমণের অর্থ সশস্ত্র সংগ্রাম নাও হতে পারে। হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ কত ভয়াবহ জাপানের জেলেদের খবর পেয়ে আজ তা আমরা বুঝতে পারছি। সমগ্র এশিয়ার মানুষের অবস্থা ওর চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে ওই বোমার ফলে, তাও বৈজ্ঞানিকদের মুখ থেকে শোনা যাচ্ছে। আমেরিকার লোকরাও যে ওই ভয়াবহ পরিণতি থেকে একেবারে মুক্ত, এমন কথা মনে করবারও কারণ নেই। কেননা শোনা যায়, সোবিয়েতও বোমা তৈরি করেছে। কতদিন আগে এইচ জি ওয়েলস্ তাঁর 'শেপ অব থিংস্ টু কাম' নামক পুস্তকে এই ভয়াবহ পরিণতির দিকে বিশ্বের বিদগ্ধদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেই বইয়ে তিনি লিখেছিলেন, এমন সব গ্যাস-বোমা যুদ্ধে ব্যবহার করা হবে যার ফলে মানুষের মাংস-হাড়-মজ্জা পচে পচে গলে যাবে। হাইড্রোজেন বোমার ভস্ম স্পর্শ করায় জাপানী জেলেদের যা হয়েছে তার খবর পাওয়া গেছে। ওয়েলস্ তার বইয়ে লিখেছিলেন, গ্যাস-বোমার যুদ্ধ যখন চলতে থাকবে, তখন হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হবে যে জাপানে জন্ম-নিরোধ হয়েছে, বোমার গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ পশু কিছুই জন্মগ্রহণ করছে না। ওয়েলস্ বলেছিলেন, ওই যুদ্ধ, পৃথিবীর শেষ মহাযুদ্ধ, চীনে অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান সভ্যতাকে ওই যুদ্ধ ধ্বংস করে দেবে। ওই যুদ্ধের পর যারা বেঁচে থাকবে, তাদের অবস্থা বোঝাবার জন্য ওয়েলস্ বলেছিলেন—তখন কলকাতা থেকে

বোম্বাইয়ের মাঝে সপ্তাহে একখানি করে ট্রেন যাতায়াত করবে, বোম্বাই থেকে মাসে একখানি জাহাজ ছাড়বে লণ্ডন অভিমুখে, ফোর্ড কোম্পানী দৈনিক তিনখানার বেশি মোটর তৈরি করবার প্রয়োজন বোধ করবে না, আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের কাজকর্ম এমন কমে যাবে যে, সময় কাটাবার জন্য তাঁকে শব্জী-বাগান রচনা করতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে পোলিশ-কোরিডোরে শুরু হবে তাও ওয়েলস্ বলেছিলেন এবং এও বলেছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অগ্নি-শিখাকেও অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হবে, জীবাণু-বোমার কথাও বলেছিলেন তিনি।

এইচ জি ওয়েলস্ যা যা বলেছিলেন তার অনেক কথা ফলেছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি হয়, তাহলে বর্তমান সভ্যতা যে ধ্বংস হবে, তা প্রায় নিশ্চিত করে আজ বলা যায়, যেহেতু দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির হাতে (আমেরিকা আর সোবিয়েত) হাইড্রোজেন বোমা মজুত রয়েছে, সোবিয়েতের নাকি অতিরিক্ত আছে নাইট্রোজেন বোমা যাকে আরো মারাত্মক বলা হচ্ছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ শেষ যুদ্ধ হোক বা নাই হোক, তা যে চীনের বুকের ওপর করবার আয়োজন চলছে তা ডালেস-নিক্সন-রবার্টসন আজ একরকম খোলসা করেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আমরা তা আজ বুঝতে পারছি, কিন্তু নয়াচীন আগেই বুঝেছে। তাই নয়া চীনের নায়করা নতুন গবর্নমেণ্ট গড়বার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি-কমিটি গঠন প্রয়োজনীয় মনে করেছেন এবং পৃথিবীর শান্তি-আন্দোলনকে আবেদনে নিবেদনে পর্যবসিত না রেখে শান্তির দাবিকে রণধ্বনি করে তুলেছেন। মহাত্মা গান্ধীও তাঁর অহিংস প্রয়াসকে ভারতে 'সংগ্রাম' রূপেই উপস্থিত করেছিলেন, 'লড়াই' 'জয়' 'সমাবেশ' 'প্রতিরোধ' প্রভৃতি সামরিক পরিভাষা তিনিও গ্রহণ করেছিলেন, যদিচ সশস্ত্র সংগ্রামকে তিনি তাঁর 'সংগ্রামে' স্থান দিতে শেষ পর্যন্ত রাজি ছিলেন না। তা না থাকলেও তিনি স্বীকার করেছেন দেশ যদি আক্রান্ত হয়,

আর দেশের লোক যদি কিছুতেই অহিংস-'সংগ্রাম' করবার মতো শক্তি অর্জন করতে না-ই পারে, তাহলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য অস্ত্রের সাহায্য নেওয়াকেও নিষ্ক্রিয়তার চেয়ে তিনি অনেক বেশি বরণীয় এবং ভীরুতার চেয়ে অনেক বেশি কাম্য মনে করবেন।

চীনের শান্তি-কমিটি যেমন গণ-স্বেচ্ছাসৈন্যদের নানা প্রকারে সাহায্য করেছেন, তাদের পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করেছেন, কোরিয়া যুদ্ধবন্দীদেরকে এবং সৈনিকদেরকেও আনন্দ দেবার জন্য নৃত্য-নাটক ও সঙ্গীত পরিবেশকদেরকে কোরিয়ায় পাঠিয়েছেন, আহতদেরকে, উত্তর কোরিয়ার বাস্তুহারাদেরকে সাহায্য করেছেন, জীবাণু-বোমা ব্যবহারের প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন—তেমন বিশ্ব শান্তি কাউন্সিলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন, নানা দেশের শান্তি-কর্মিদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করেছেন, নানা দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল আমন্ত্রণ করে নিয়ে সকল দেশের সঙ্গে মৈত্রীর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন, নানা দেশের যে-সব কীর্তিমান কবি-শিল্পীরা মানব-মৈত্রীর বাণী যুগে যুগে প্রচার করে গেছেন, তাঁদের দানের কথা বছরে-বছরে, স্মৃতি-উৎসবের সাহায্যে, নয়াচীনের তরুণ-তরুণীদের বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন। রাজনীতি রাষ্ট্র বিশেষের নীতি। সে নীতি এক রাষ্ট্রে আর-এক রাষ্ট্র থেকে পৃথক রূপ যদিও বা নিতে পারে, মানবতার এক নীতি সকল মানুষকেই প্রীতির ডোরে বাঁধতে পারে। সেই প্রীতির বন্ধনই পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, এই বিশ্বাস নিয়েই নয়া চীনের শান্তি-কমিটি কাজ করে যাচ্ছেন।

যে-কেউ ইচ্ছা করলেই শান্তি কমিটির সদস্য হতে পারেন না। সদস্য বলে কেবল তাঁরাই গৃহীত হয়েছেন, যাঁরা কোন গণতান্ত্রিক দল কর্তৃক কিম্বা কোন গণ-সঙ্ঘ কর্তৃক প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হয়েছেন। বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে, খামারে, স্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, গণ-সঙ্ঘে তিন

হাজার শাখা কমিটি কাজ করছেন। দেশের বাইরে এবং দেশের ভিতরে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা প্রচার কমিটির একটি প্রধান কাজ। কমিটির কর্মীরা, পদাধিকারীরা ব্যতীত সকলেই বেতনভুক্ এবং একান্তভাবেই কমিটির কাজে নিযুক্ত। যাঁরা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে দোভাষীর কাজ করে আমাদেরকে সহায়তা করতেন, তাঁরা সকলেই শান্তি কমিটির স্থায়ী কর্মী। আমরা যখন যে শহরে যেতাম, সেখানকার শান্তি কমিটিই আমাদের অভিভাবক হতেন এবং অতিথি আপ্যায়নের সকল দায়িত্ব নিতেন। শান্তি কমিটির কর্মীরা প্রায় সামরিক শৃঙ্খলা নিয়ে কাজ করেন অথচ তাঁদের শিষ্টাচার ও সৌজন্য যেমন মধুর তেমনই আন্তরিক। শান্তিকে তাঁরা সত্য সত্যই কামনার ধন বলে মনে করেন। কিন্তু নয়া চীনের এই আন্তরিক কামনাকে ব্যর্থ করে দেবার যে আয়োজন আজ তাকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, পৃথিবীর সমগ্র শান্তিকাম মানুষ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তা ব্যর্থ করে দিতে অগ্রসর না হয়, তাহলে নয়া চীনকে বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে কিনা, আজ তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

আণবিক বোমা চীন তৈরি করছে কিনা, তা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কোন বিদেশীর পক্ষেই তা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু জাপানী বৈজ্ঞানিক সিগেহোসী মাৎসুমাইয়ে প্রকাশ করেছেন যে, সিনকিয়াং অঞ্চলে কারখানা প্রতিষ্ঠায় চীনের চাঞ্চল্যের কারণ তাঁর মনে সন্দেহের সঞ্চার করেছিল, যখন পিকিংয়ে ওই অঞ্চলের ম্যাপ তিনি দেখেছিলেন। কিন্তু এখন যখন তিনি জেনেছেন যে প্রকৃতি ওই অঞ্চলে প্রচুর ইউরেনিয়াম সঞ্চয় করে রেখেছেন, তখন তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন যে, মানচিত্রে তাঁর দেখা কারখানাগুলি আণবিক বোমার কারখানা ছাড়া কিছু নয়। জাপানের আর একজন বিশেষজ্ঞ ডক্টর ফুমিদ ইয়ামাজাকি বলেছেন যে, চীনে বহু দক্ষ নিউক্লিয়ার পদার্থ-

বিজ্ঞানী আছেন। কিন্তু তা থেকে এ-কথা জোর করে বলা যায়না যে, চীন আণবিক বোমা তৈরির দক্ষতা অর্জন করেছে। তিনি অনুমান করেন সোবিয়েত হয় তৈরি বোমা সরবরাহ করছে, না হয় তৈরি করা শিখিয়ে দিচ্ছে। সত্য মিথ্যা নির্ণয় আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। চীন যদি আণবিক বোমা তৈরিতে মন দিয়েও থাকে, তাও দিয়েছে আত্মরক্ষার তাগিদে। তার জন্যও এ কথা বলা যায়না যে, চীন কখনই সত্যি করে শান্তি চায়নি বা এখনো চায়না। আমেরিকার নির্লজ্জ দাম্ভিকতা ও অমানুষিক হত্যা-লোলুপতা লক্ষ্য করে শরৎচন্দ্রের সব্যসাচীর মতো নয়াচীনও মনে করতে পারে—"দূর থেকে এসে যে আমার মাতৃভূমি অধিকার করল, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, নিশ্বাসের বায়ু হরণ করল, তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, রইল না কেবল আমার?" কখনো যদি নয়া চীনকে ওই মনোভাবের পরিচয় দিতে হয়, তখন কিন্তু বলা যাবে না, আমেরিকার জন্যই বলা যাবে না, চীন মনে-প্রাণে শান্তি চায় নি।
